জান্নাতের সঠিক পথ

মূল

হযরত মাওলানা রফী উসমানী

সংযোজিত

রোগ-দুশ্চিন্তাও আল্লাহর নেয়ামত

মূল

হযরত মাওলানা তকী উসমানী

রূপান্তর

হাফেজ মাওলানা শাববীর আহমাদ শিবলী

'জান্নাতের সঠিক পথ' জগতবিখ্যাত আলেমে দ্বীন (মুফতীয়ে আজম পাকিস্তান) হযরত মাওলানা মুফতী শফী (রাহঃ)-এর সুযোগ্য সাহেবজাদা হযরত মাওলানা রফী উসমানী সাহেবের একটি উর্দু বয়ানের বাংলা রূপান্তর। আলোচ্য বয়ানটিতে হযরত রফী উসমানী সাহেব তাঁর মুরশিদ এবং হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রাহঃ)-এর বিশিষ্ট খলীফা আরেফবিল্লাহ ডাক্তার আবদুল হাই আরেফী সাহেবের বর্ণনাকৃত চারটি বিশেষ আমল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আমল চারটি হচ্ছে-শোকর, সবর, এস্তেগফার ও এস্তে'আযাহ।

ব্যস্ততামুখর পৃথিবীর বুকে মানুষ আজ যে কোন কাজেই অধিক সময়, অধিক শ্রম ব্যায় করতে রাজী নয়, বরং অল্প সময়ে অল্প শ্রমের বিনিময়ে অধিক মুনাফা লাভের জন্য সকলেই আগ্রহী আর তাই অল্প সময় ও শ্রমের বিনিময়ে অধিক মুনাফা লাভের পথ ও পদ্ধতি আবিস্কারের গবেষণা দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে।

আরেফবিল্লাহ ডাক্তার আবদুল হাই আরেফী সাহেবের বর্ণিত চারটি আমলই এমন, যেগুলো বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে তেমন সময়, মেধা ও শ্রম ব্যায় করার প্রয়োজন পড়ে না। জীবন চলার স্বাভাবিক গতিতেই যে কেউ আমল চতুষ্টয়কে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম, তবে প্রয়োজন শুধু একটুখানী সদিচ্ছার এবং উদ্যোগের। ফলশ্রুতিতে আমলকারীর জন্য বয়ে আনবে তা ইহকালীন সফলতা ও পরকালীন মুক্তি। আল্লাহপাক আমাদের তাওফীক দিন।

রফী উসমানী সাহেবের বয়ানটির সাথে সংযোজিত হয়েছে তাঁরই অনুজ পাকিস্তান শর'য়ী আদালতের জাস্টিজ আল্লামা তকী উসমানী সাহেবের 'রোগ-দুশ্চিন্তাও আল্লাহর নেয়ামত' শীর্ষক আরো একটি বয়ান।

প্রাত্যহিক জীবনে আমরা অহর্নিশ নানাবিধ দুঃখ-কষ্ট, বিষাদ-বেদনায় জর্জরিত হই, রোগ-বালা মসীবতে আক্রান্ত হই। আমাদের উপর পতিত

বালা-মসীবত ও দুঃখ-কষ্টও যে আমাদের জন্য রহমত এবং পুণ্যবৃদ্ধির মাধ্যম হতে পারে, তা হয়ত আমাদের অনেকেরই জানা নেই, ফলে তকদীর তথা মহান আল্লাহর বিধিবদ্ধ ফায়সালার উপর প্রশ্ন তোলে, আপত্তি-অভিযোগ উত্থাপন করে আমরা আমাদের ঈমান-আমলকে শংকার মধ্যে ফেলে দেই। এভাবে মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে আমাদের দূরত্ব সৃষ্টি হয়, আমাদের পরকালীন জীবন ক্ষতি ও শংকাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আর এ জন্য দায়ী মূলত: আমাদের অজ্ঞতা।

বিদগ্ধ আলেম আল্লামা তকী উসমানী সাহেবের জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় বিষয়টি এতই সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যে, যে কেউ সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক দিক-নির্দেশনা খুঁজে পাবেন এবং এর দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হবেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

'জান্নাতের সঠিক পথ' প্রকাশনার গুরু দায়িত্ব নিয়েছে ধর্মীয় ও মননশীল সাহিত্য সৃষ্টির নিরলস প্রচেষ্টায় রত 'নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী'।

আল্লাহ তা'আলা বইটিকে ওসীলা করে আমাদের সকলের নাযাত ও মুক্তির ফায়সালা করুন এবং আমাদের সকলকে 'জান্নাতের সঠিক পথ' আকড়ে ধরার তাওফীক এনায়েত করুন। আমীন।

বিনয়াবনত

শাববীর আহমাদ শিবলী

১৫/২/২০০১ ইং

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
জান্নাতের সঠিক পথ	১১
তিন ব্যক্তি	১১
দ্বীনী মজলিস মহান আল্লাহর নেয়ামত	১২
মৃত্যুর খবর কারো জানা নেই	১৩
মালাকুল মওতের প্রসিদ্ধ ঘটনা	১৪
এক ব্যক্তির উপর তোমার দু'বার করুণা হয়েছে	১৫
তাওবার দরজা সর্বদা উন্মুক্ত	১৬
গোনাহ থেকে কিভাবে বেঁচে থাকবে	১৬
গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা আল্লাহর অনুগ্রহ এবং গোনাহের সুযোগ আল্লাহর গযব	১৭
শ্রদ্ধেয় পিতার নিকট বায়আত হওয়ার আবেদন	১৮
জ্ঞানের অহংকার পতনের মূল	১৯
আরেফবিল্লাহ ডাঃ আবদুল হাই সাহেব (রাঃ)	১৯
চারটি অতি মূল্যবান আমল	২০
মুরশিদের তোহ্‌ফা	২১
শোকর	২২
শোকরের স্থানসমূহ	২২
অসংখ্য অগণিত নেয়ামত আমরা ভোগ করছি	২৩
শোকর দ্বারা নেয়ামত বৃদ্ধি এবং আযাব থেকে নিষ্কৃতি মিলে	২৪
এটা মহান আল্লাহর একটি পছন্দনীয় ইবাদত	২৪
এই ইবাদতটি জান্নাতেও অব্যাহত থাকবে	২৫
এক কাঠুরিয়ার ঘটনা	২৫
শোকর দ্বারা সবর এবং তাকওয়া সৃষ্টি হয়	২৬
শোকর অহংকার দূরিভূত করে	২৭
সবর	২৭
'ইন্নালিল্লাহ' বাক্যটি শুধু মৃত্যুর সাথেই সম্পর্কযুক্ত নয়	২৯
মোল্লা নাসিরুদ্দীনের ঘটনা	২৯
ধৈর্যধারণকারীর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়	৩০
এস্তেগফার	৩১
শয়তানের চ্যালেঞ্জ	৩১
আল্লাহর দেয়া হাতিয়ার	৩১
এস্তেগফার দ্বারা গোনাহ মাফ হয়	৩২
যতবার গোনাহ হবে ততবার তওবা করে নিবে	৩২
এস্তেগফারের ফায়েদা	৩৪
এস্তে'আযাহ	৩৫
যে কোন ভয়-শংকায় 'আ'উযুবিল্লাহ' পড়বে	৩৬
এক চোরের অসহায়ত্ব	৩৭
তীরান্দাযের আঁচল আকড়ে ধর	৩৮
চারটি আমলই আমাদের অভ্যাসে পরিণত হোক	৩৯
তিন কাল সংরক্ষিত হবে	৩৯
এই তোহ্‌ফাটুকু অন্যদের নিকট পৌছে দিন	৪০

বিষয়	পৃষ্ঠা
রোগ-দুশ্চিন্তাও আল্লাহর নেয়ামত	৪১
দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থার জন্য সুসংবাদ	৪৩
দুশ্চিন্তা দুই প্রকার	৪৩
বিপদাপদ দুঃখ-কষ্ট আল্লাহর আযাব	৪৪
কষ্ট-মসীবত আল্লাহর রহমতও	৪৪
এ জগতের কেউ বিপদাপদ ও দুশ্চিন্তা মুক্ত নয়	৪৫
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা	৪৬
প্রত্যেক ব্যক্তির প্রদত্ত নেয়াতম ভিন্ন ভিন্ন	৪৮
আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের দুঃখ-কষ্ট কেন?	৪৮
ধৈর্যশীলদের পুরস্কার	৪৯
কষ্ট-মসীবতের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত	৫০
দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত	৫১
কষ্ট-মসীবতে 'ইন্না লিল্লাহ' পাঠকারী	৫২
আমি বন্ধুদেরকে কষ্ট দিয়ে থাকি	৫২
এক আশ্চর্যজনক ঘটনা	৫৩
এই কষ্ট-মসীবত বাধ্যতামূলক সাধনা	৫৫
কষ্ট-মসীবতের তৃতীয় দৃষ্টান্ত	৫৬
চতুর্থ দৃষ্টান্ত	৫৬
হযরত আইয়ূব আলাইসি সালাম এবং কষ্ট-মসীবত	৫৭
কষ্ট-মসীবত রহমত হওয়ার আলামত	৫৮
দোয়া কবুল হওয়ার আলামত	৫৯
হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব (রাহঃ)-এর ঘটনা	৬০
হাদীসের সারকথা	৬১
কষ্ট-মসীবতে দীনতা-হীনতা প্রকাশ করা উচিত	৬১
এক বুযুর্গের ঘটনা	৬১
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা	৬২
কষ্ট-মসীবতে রাসূল (সাঃ)-এর তরীকা	৬৩

জান্নাতের সঠিক পথ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ ○

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথ ভয় কর এবং আনুগত্যশীল বান্দা না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।' (সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১০২)

উপস্থিত বুযুর্গানে মুহতারাম! হযরত ওলামায়ে কেরাম এবং সম্মানিত শ্রোতাবৃন্দ! মহান আল্লাহর লাখ লাখ শোকর যে তিনি প্রতি বছর একটি জাতীয় সম্মেলন 'মজলিসে সিয়ানাতুল মুসলিমীন' অনুষ্ঠিত করার তওফীক দান করেন। এতে অনেক কল্যাণ নিহিত থাকে। যে সকল হযরত দেশময় বছর ধরে মজলিসের খেদমত আঞ্জান দিয়ে থাকেন, এই সম্মেলন উপলক্ষ্যে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তাছাড়া মুসলমানদের প্রতিটা মজলিসেই বিশেষ বরকত নিহিত থাকে। যখন মুসলমানগণ দ্বীনী জ্ঞান অর্জনের জন্য কোন মজলিসে একত্রিত হয়, তখন সেখানে আল্লাহর রহমত বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিত হতে থাকে। ফেরেশ্‌তাগণ তাদের চলার পথে স্বীয় নূরের পাখা বিছিয়ে দেন এবং এরূপ মজলিসে দোয়া কবুল হয়ে থাকে।

এ মহূর্তে আমার মাথায় বিষয়বস্তুর ভীড় জমে আছে। কোন্ বিষয়ের উপর আলোচনা করব, তা স্থির করতে পাছি না। কেননা সমস্যা এবং প্রয়োজন অনেক। এ ধরনের মুহূর্তে কার্যকরী পন্থা এটাই যে, সব কিছু আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়া। তিনি যা কিছু বলার তাওফীক দান করবেন, ইনশাআল্লাহ তাতেই মঙ্গল নিহিত।

তিন ব্যক্তি

এক্ষুণি এই মুহূর্তে আমার একটি ঘটনা স্মরণ এসেছে সেটা হলো, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে বসা ছিলেন। সাহাবাগণ তাঁর চতুর্পার্শ্বে উপস্থিত। ইতিমধ্যে তিন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল। আগত তিন ব্যক্তির কারো জানা ছিল না যে, মসজিদে রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত রয়েছেন। তারা যখন জানতে পারল যে, এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত রয়েছেন, তখন তিন জনের এক জন খুশি মনে দ্রুত প্রিয়নবীর মজলিসে শরীক হয়ে গেল। দ্বিতীয় ব্যক্তি লোক-লজ্জার ভয়ে পিছনে বসে গেল, কারণ এ অবস্থায় চলে গেলে মানুষ খারাপ বলবে। আর তৃতীয় ব্যক্তি না বসে চলে গেল।

অবস্থাদৃষ্টে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তিনজন ব্যক্তি মজলিসে উপস্থিত হয়েছে, তন্মধ্যে একজন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আশ্রয় গ্রহণ করেছে, ফলে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলও তাঁকে আশ্রয় প্রদান করেছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি লোক-লজ্জার ভয়ে মজলিসে শরীক হয়েছে, আর একই মজলিসের কোন ব্যক্তিকে সওয়াব থেকে বঞ্চিত করতে আল্লাহপাক লজ্জাবোধ করেন, তাই মজলিসের অন্যান্যরা যে পরিমাণ সওয়াবের অধিকারী হবে, সেও সে পরিমাণ সওয়াব পাবে। রইল তৃতীয় ব্যক্তি। সে যেহেতু আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তাই আল্লাহ এবং রাসূলেরও তার কোন প্রয়োজন নেই।

দ্বীনী মজলিস মহান আল্লাহর নেয়ামত

মহান আল্লাহ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে সকল মজলিস অনুষ্ঠিত হয়, সে সকল মজলিস মূলত: আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আঁচল আকড়ে ধরার ওসীলা হয়। কেননা এ ধরনের মজলিসে বসার উদ্দেশ্যই হয় এই যে, আল্লাহ এবং রাসূল সম্পর্কে কোন কথা শ্রবণ করে মনেপ্রাণে তা গ্রহণ করা, আল্লাহর ভয়, পরকালের স্মরণ অন্তরে সৃষ্টি করা, যার ওসীলায় আমাদের আমল–আখলাক সংশোধন হবে এবং দ্বীনের পথে চলা সহজ হবে। সুতরাং এ ধরনের মজলিস মহান আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত। কারণ মানুষের স্বভাব বা প্রকৃতি হলো সে অন্যকে দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে। অপরকে নেক কাজ করতে দেখে নিজের মনেও অনুশোচনা সৃষ্টি হয়, সে ভাবে- আমিও কেন নেক কাজ করছি না; আমারও তো নেক কাজ করা উচিত। এভাবে মানুষ অন্যকে দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে। এমনিভাবে এ ধরনের মজলিস দ্বারা মুসলমানদের মাঝে পারস্পরিক ভালবাসা-মহাব্বত বৃদ্ধি পায় ফলে দ্বীনী কর্ম-কাণ্ডে

সহজবোধ্যতা বা আসানী সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহ তা'আলার অপার মহিমায় এ ধরনের মজলিসে দোয়া-প্রার্থনা অতি দ্রুত কবুল হয়।

যে স্থানে বসে বহু আল্লাহওয়ালা এবং আমার বহু উস্তাদ মহোদয় আলোচনা রেখেছেন, সেখানে আমার ন্যায় 'মক্তবের শিক্ষার্থী'র জন্য বক্তব্য রাখা খুবই ধৃষ্টতা বলে মনে হচ্ছে। কারণ এখানে বসে হযরত থানভী (রাহঃ)-এর অনেক বড় বড় খলীফা আলোচনা করতেন। এখানে বসে আলোচনা করতেন হযরত মাওলানা মুফতী মাহ্মূদ হাসান (রাহঃ), আমার শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত মাওলানা মুফতী শফী (রাহঃ), হযরত মাওলানা মুফতী যাফর আহমদ ওসমানী (রাহঃ), হযরত মাওলানা খায়ের মুহাম্মদ সাহেব জালন্ধরী (রাহঃ), হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মদ তাইয়েব সাহেব (রাহঃ), হযরত মাওলানা ইদ্রীস কান্ধলভী (রাহঃ) এবং হযরত মাওলানা মসীহ উল্লাহ খান সাহেব (রাহঃ)। এখানে বসে দু'চার কথা বলার কল্পনাও করতে পারি না, তথাপি বুযুর্গদের নির্দেশ এবং মজলিসের সৃংখলা রক্ষার তাগিদে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় এখানে বসতে হয়েছে, যাতে আপনাদের সাথে আমি অধমও আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আলোচনায় শরীক হয়ে ধন্য হতে পারি।

আমি খোত্বায় যে আয়াতখানা তেলাওয়াত করেছি, সে আয়াতে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা মহান আল্লাহকে যথাযথ ভয় করো।' অর্থাৎ যে সকল বিষয় সম্পর্কে তিনি নিষেধ করেছেন, তার ধারে কাছেও তোমরা যাবে না আর যে সকল কাজ করার হুকুম করেছেন, সেসব আদায়ে মোটেও অবহেলা করবে না। আর এরই নাম 'তাকওয়া' বা খোদাভীতি। এর পর তিনি বলেন, 'তোমরা কখনও মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।' অর্থাৎ তাঁর নাফরমানী করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না।

মৃত্যুর খবর কারো জানা নেই

মৃত্যুবরণ করা বা জীবিত থাকা এটা মানুষের এখতিয়ার বা ইচ্ছাধীন বিষয় নয়। পৃথিবীর কোন মানুষের এ কথা মোটেও জানা নেই যে কার মৃত্যু কখন এবং কিভাবে আসবে। কখনও কখনও মালাকুল মওত অর্থাৎ প্রাণ কবয্কারী ফেরেশ্তাকে এমন লোকদের রূহ কবয্ করার লিষ্টও দেয়া হয়, যারা বছরের পর বছরের প্রোগ্রাম তৈরীতে ব্যস্ত। তারা প্লান তৈরী

করছে, অমুক কাজটি আগামী বছর এভাবে করতে হবে, অমুক কাজটি আগামী মাসে এভাবে আঞ্জাম দিতে হবে। তাদের অবস্থা দেখে মালাকুল মওত আড়াল থেকে হাসে যে, এদেরতো এ কথা মোটেও জানা নেই যে, জীবনের আর মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত অবশিষ্ট রয়েছে। আর কারো আত্মা কবয্ করতে মালাকুল মওতের দয়াও হয় না, কারণ তিনি মহান আল্লাহর বাধ্যগত দাস। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন যে নির্দেশই আসবে তাই তিনি নির্দ্বিধায় পালন করতে বাধ্য।

মালাকুল মওতের প্রসিদ্ধ ঘটনা

এ ঘটনা প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, একবার আল্লাহ তা'আলা মালাকুল মওতকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তো জীবনে অসংখ্য অগণিত আত্মা কবয্ করেছো, তোমার দিবস-রজনীর কাজই এটা। আচ্ছা বলতো কখনও কারো আত্মা কবয্ করতে তোমার মনে দয়ার উদ্রেক হয়েছে কি না? তোমার মনে কষ্ট লেগেছে কি না?

মালাকুল মওত আরয করলেন, আমার এই জীবনে মাত্র দুই ব্যক্তির আত্মা কবয করতে আমার দয়া হয়েছে এবং মনে কষ্ট লেগেছে।

আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করলেন, সে দুই ব্যক্তি কে? যে দুই ব্যক্তির আত্মা কবয করতে তোমার দয়া লেগেছে?

মালাকুল মওত আরয করলেন, একদা একটি সামুদ্রিক জাহাযে নারী-পুরুষ এবং বাচ্চারা সফর করছিল। সফর অবস্থায় হঠাৎ সমুদ্রে ভীষণ ঝড় উঠলে জাহাযটি ডুবে গেল। যার ফলে কিছু লোক সমুদ্রের অথৈ জলরাশিতে ডুবে প্রাণ হারাল আর কিছু লোক জাহাযের ভাঙ্গা কাঠখণ্ড আকড়ে ধরে নিজেদের প্রাণরক্ষা করতে সমর্থ হল। সে জাহাযে ছিল একজন গর্ভবতী মহিলা। জাহাযের একটি বড় কাঠের টুকরা তার নাগালের মধ্যে চলে আসার ফলে সেও সেটা আকড়ে ধরে নিজের জীবন রক্ষা করে। সমুদ্রের গভীর ও নিঃসীম অন্ধকার, তার উপর প্রচন্ড ঝড় এবং পাহাড় সম ঢেউয়ের মাঝে সে মহিলা কাঠের টুকরাটিকে জীবনের সর্বশেষ অবলম্বন হিসেবে আকড়ে ধরে রাখে। আর সেই অবস্থায় তার একটি বাচ্চা প্রসব হয় এবং সে বাচ্চাকে বুকের সাথে জড়িয়ে রাখে। এই সংকটময় মুহূর্তে

বাচ্চাকে কোন কিছু খাওয়ানো এবং বাচ্চার জীবন রক্ষার কোন উপায়-উপকরণই সেখানে উপস্থিত ছিল না।

ঠিক এমনি মুহূর্তে হে পরওয়ারদিগার! আপনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন সে মহিলার জান কবয করার জন্য। প্রভু হে! আপনার নির্দেশ পালনার্থে সেদিন সেই মহিলার আত্মা কবয্ করেছি ঠিক কিন্তু আজো আমার মনে দয়ার উদ্রেক হয় সে ছেলেটির জন্য। পরবর্তীতে তার কি অবস্থা হয়েছিল, তা জানতে মনে খুব ইচ্ছে জাগে!

আল্লাহ তা'আলা মালাকুল মওতকে বললেন, দ্বিতীয় কোন্ ব্যক্তির রূহ কবয করতে তোমার দয়া হয়েছে?

মালাকুল মওত বললেন, শাদ্দাদ নামী আপনার এক নাফরমান বান্দা ছিল, যাকে আপনি বাদশাহী এবং অঢেল ধন-সম্পদের মালিক বানিয়েছিলেন। সে পৃথিবীর বুকে জান্নাত বানানোর ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে এবং বানানো শুরু করে। তার কথিত জান্নাতের পিছনে সে অজস্র সম্পদ খরচ করতে থাকে। আর সে এই সিদ্ধান্ত নেয় যে জান্নাত পূরাপূরী তৈরী হলে সে তার কথিত জান্নাতে প্রবেশ করবে। বছরের পর বছর অপেক্ষা করার পর তার জান্নাত তৈরী হয় এবং তার জান্নাতে প্রবেশের বহু আকাঙ্খিত মুহূর্তটি ঘনিয়ে আসে। ইতিমধ্যে তার দলবল নিয়ে সে জান্নাতের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয় এবং একটি মাত্র পা ভিতরে রাখে, দ্বিতীয় পা তার এখনও বাইরে; এমনি মুহূর্তে হে রাব্বুল আলামীন আপনার নির্দেশ হলো তার রূহ কবয করে নিতে। তার রূহ কবয করে আমি আপনার নির্দেশ পালন করেছি সত্য, কিন্তু আজো আমার দয়া হয় তার জন্য যে, এত দীর্ঘকাল ধরে এবং এত পরিমাণ অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেও তার জান্নাত দেখার সৌভাগ্য হলো না।

এক ব্যক্তির উপর তোমার দু'বার করুণা হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে মালাকুল মওত! একই ব্যক্তির উপর তোমার দু'বার করুণা হয়েছে। তোমার জানা নেই যে, এই শাদ্দাদই ঐ শিশু বাচ্চা, যার মায়ের আত্মা তুমি অন্ধকারময় এক ঝড়ের রজনীতে সমুদ্র বক্ষে কবয করেছিলে। আমি আমার অসীম রহমত ও শানে রবূবিয়ত দ্বারা সেই বাচ্চাকে সেদিনের সেই কঠিন অবস্থা থেকে বাঁচিয়েছি এবং নিরাপদে সমুদ্র

তীরে এনে পৌছিয়েছি। শুধু তাই নয় তাকে মেধা, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, সুস্থতা, শক্তি-সামর্থ, ইয্যত-সম্মান ইত্যাদি সব কিছু দান করেছি এমনকি এক পর্যায়ে তাকে বাদশাহী প্রদান করেছি। বাদশাহী পাওয়ার পর এক পর্যায়ে সে আমার সাথে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে এবং জান্নাত তৈরীর উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু আমি তাকে তার কথিত জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ দেইনি। সুতরাং সেই একই ব্যক্তির উপর তোমার দু'বার করুণা হয়েছে।

তাই বলছিলাম আমাদের জীবনের কোন ভরসা নেই। যে কোন সময় যে কোন মুহূর্তে মালাকুল মওত আমাদের দ্বারপ্রান্তে এসে হাযির হতে পারে। সুতরাং পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ০

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর আনুগত্যশীল বান্দা না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। মৃত্যুবরণ করাটা যদিও অনিচ্ছাধীন বিষয়, কিন্তু ভাল অবস্থা নিয়ে মৃত্যুবরণ করা এটা ইচ্ছাধীন। আর তার তরীকা হলো এই যে, নিজেকে সর্বদা সব ধরনের পাপকার্য থেকে দূরে রাখতে সচেষ্ট থাকতে হবে; কখনও ঘটনাচক্রে গোনাহ হয়ে গেলে সাথে সাথে তাওবা-এস্তেগফার করতে হবে।

তাওবার দরজা সর্বদা উন্মুক্ত

আল্লাহ তা'আলা তাওবার দরজা সর্বদা উন্মুক্ত রেখেছেন। গোনাহ যতই হোক বান্দা তাওবা করলে তিনি সাথে সাথে তা ক্ষমা করে দেন। তবে যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে এবং প্রাণসংহারকারী ফেরেশ্তা দৃষ্টিগোচর হতে থাকে, তখন আর তাওবার সুযোগ থাকে না। কিন্তু যে ব্যক্তি সদা-সর্বদা তাওবা-এস্তেগফারের অভ্যস্ত ছিল, আল্লাহ না করুন সে যদি কোন গোনাহে লিপ্ত থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার এমন একটি গোনাহ অবশিষ্ট রয়ে গেল, যেটির তাওবা করার সুযোগ তার হয়নি। সুতরাং সদা-সর্বদা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকা উচিত।

গোনাহ থেকে কিভাবে বেঁচে থাকবে

এখন প্রশ্ন আসে গোনাহ থেকে কিভাবে বাঁচা যাবে? কেননা চতুর্দিকে আজকে ফেৎনার বন্যা বয়ে চলছে। পূরা সমাজটাই পাপাচার আর অন্যায় অপকর্মে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। এহেন দুঃসময়ে এবং প্রতিকুল পরিস্থিতিতে মানুষ কিভাবে নিজেকে গোনাহ থেকে মুক্ত রাখবে। চক্ষু, কর্ণ এবং হস্তদ্বয় কিভাবে গোনাহমুক্ত রাখবে। সুতরাং এটি নিঃসন্দেহে কঠিন বিষয়। যদিও মুখে বলা সহজ কিন্তু বাস্তবায়ন খুবই কঠিন। এহেন কঠিন পরিস্থিতি অতিক্রম করার জন্য উলামায়ে কেরাম, বুযুর্গানে দ্বীন এমন কি পবিত্র কুরআন যে বিষয়টির প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে, তা হল, নেককারদের সাহচর্য অবলম্বন। তাদের সংস্পর্শে অধিক সময় ব্যয় করার চেষ্টা করা। রিয়াযত-মোজাহাদা ও সাধনা করা, ফলে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা সহজ হবে এবং নেক কাজ করতে আসানী অনুভব হবে। সব কথার মূল কথা হলো অন্তরের অবস্থা এমন হয়ে যাওয়া যে, নেক কাজের প্রতি আগ্রহ-উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে এবং গোনাহের প্রতি উদাসীনতা এবং ঘৃণা সৃষ্টি হবে। আর এ অবস্থাটা আল্লাহওয়ালাদের সাহচর্য বা সুহ্বতে থাকার দৌলতে অর্জন হয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ ০

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর অর্থাৎ গোনাহ থেকে বেঁচে থাক। আর গোনাহ থেকে বাঁচার পথ হলো এই যে, নেককারদের সাহচর্য অবলম্বল কর। (সূরা তাওবা, আয়াত ১১৯)

গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা আল্লাহর অনুগ্রহ এবং গোনাহের সুযোগ পাওয়া আল্লাহর গযব

আসল কথা হলো যখন আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক গভীর হয়ে যায়, তখন শত চেষ্টা করলেও গোনাহ সংঘটিত হয় না। দিল-মনে এমন নূর অর্জিত হয় যে, গোনাহের নিকটবর্তী হতেও ভয় অনুভূত হয়। অত:পর আল্লাহ তা'আলা এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দেন যে, অন্তরই গোনাহ থেকে দূরে সরে যায় ফলে বান্দা অনিচ্ছায় গোনাহ থেকে বেঁচে থাকতে সক্ষম হয়। আর মহান আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে এভাবেই বান্দাকে গোনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। অপরদিকে যখন কাউকে একাধারে গোনাহের সুযোগ দেয়া

হয়, তখন মনে করতে হবে এটা আল্লাহর গযবের পূর্বলক্ষণ। কেননা গোনাহের সুযোগ দেয়ার পর হঠাৎ একদিন আযাব এসে আক্রমন করে বসে। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ○

অর্থাৎ নিশ্চয় তোমার পালনকর্তার পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন।

(সূরা বুরূজ, আয়াত ১২)

সুতরাং বুযুর্গগণের সাহচর্য এবং দীক্ষায় নেক কাজ করা সহজবোধ্য এবং মজাদার হয়ে যায় আর গোনাহ দুর্বোধ্য মনে হয় এবং গোনাহের প্রতি ভয়-ভীতি এবং অনিহা সৃষ্টি হয়। আর এ জন্যেই বুযুর্গগণের সাথে বায়আতের সম্পর্ক স্থাপন করা হয়।

শ্রদ্ধেয় পিতার নিকট বায়আত হওয়ার আবেদন

আমার শ্রদ্ধেয় আব্বাজান মুফতীয়ে আজম পাকিস্তান হযরত মাওলানা মুফতী শফী (রাহঃ)। লোকেরা তাঁর সম্পর্কে খুব ভাল করেই জানত যে, তিনি নিজের সন্তানদের উপর কী পরিমাণ মমতাবান ছিলেন। এমনকি লোকেরা নিজের সন্তানদের নিকট তাঁর স্নেহ-মমতার দৃষ্টান্ত পেশ করে থাকত। তিনি আমার উস্তাযও ছিলেন এ দৃষ্টিকোণ্ থেকে মহাব্বত আরো অধিক ছিল। আমি একাধিকবার আব্বাজানের নিকট এই আবেদন পেশ করেছি যে আমাকে বায়আত করে নিন। আব্বাজান প্রতিবারই বলতেন, 'হযরত ডাঃ আবদুল হাই আরেফী সাহেবের নিকট বায়আত হও।' আমার তখন কোনভাবেই বুঝে আসত না যে, আব্বাজান হযরত ডাঃ আবদুল হাই আরেফী সাহেবের নিকট বায়আত হওয়ার জন্য এভাবে পিড়াপিড়ি করছেন কেন?

একবার আব্বাজানের সাথে আফ্রিকার এক সফরে প্রায় পৌনে দুই মাস সাথে থাকার সুযোগ হয়। করাচীতে একান্তে কথা বলার সুযোগ খুব কমই হত, কেননা সদা-সর্বদা লোকজনের ভীড় লেগে থাকত। সেই সফরে একাকীত্বকে একটা বিরাট সুযোগ মনে আব্বাজানের নিকট আবার বায়আতের আবেদন করে বসলাম। সে দিন আব্বাজান খুবই গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং বললেন, দেখ! পিতার নিকট সন্তানের বায়আত হওয়ার দৃষ্টান্ত

ইতিহাসের পাতায় রয়েছে সত্য এবং আলহামদুলিল্লাহ বায়আত হয়ে অনেকে সফলও হয়েছেন, তবে এ অবস্থায় উভয়কে খুবই সাবধানতার সাথে পথ চলতে হয়। কারণ পীর মুরিদীর সম্পর্কের মাঝে লৌকিকতাহীন সম্পর্ক ক্ষতিকর প্রমানিত হয়। আর বাপ বেটার সম্পর্ক হয় লৌকিকতাহীন। সুতরাং এটা আমাদের উভয়ের জন্য কষ্টকর হবে। অতএব তুমি ডাঃ আবদুল হাই আরেফী সাহেবের নিকট বায়আত হও।

জ্ঞানের অহংকার পতনের মূল

অত:পর আব্বাজান (রাহঃ) বললেন, ডাঃ আবদুল হাই আরেফী সাহেবের নিকট বায়আত হওয়ার দ্বারা একটা বড় লাভ এই হবে যে, যখন একজন আলেম একজন এমন ব্যক্তির নিকট মুরীদ হবে, যাঁকে রীতিমত আলেমে দ্বীন মনে করা হয় না, তো এর দ্বারা এলেমের অহংকার দূর হয়ে যাবে। কেননা একজন আলেমের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি এবং ধ্বংস এই এলেমের অহংকারের কারণে সংঘটিত হয়, যা তাকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীসের মর্মার্থ এরূপ যে, যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে না। মোটকথা হযরত আব্বাজান আমাদের দুই ভাই অর্থাৎ মাওলানা তকী উসমানী এবং আমাকে হযরত ডাঃ আবদুল হাই আরেফী সাহেবের হাতে তুলে দিলেন এবং আমরা উভয়ে তাঁর হাতে বায়আত হই।

আরেফবিল্লাহ ডাঃ আবদুল হাই সাহেব (রাহঃ)

আমি মাঝে মাঝে ভাবি শ্রদ্ধেয় আব্বাজান আমার উপর কি পরিমাণ করুণা করেছেন! তিনি আমাদের অত্যন্ত দরদী পিতা, উস্তায এবং মুরব্বী ছিলেন! কিন্তু তাঁর সবচেয়ে অনুগ্রহ হলো এই যে, তিনি আমাদেরকে এক আরেফবিল্লাহ্‌র (খোদাপ্রেমীর) হাতে সোপর্দ করে গেছেন। আব্বাজানের ইন্তেকাল হয়ে গেলে তাঁর জানাযা রাখা হল। আমি তখন আব্বাজানের পায়ের দিকে দাঁড়ানো ছিলাম। হযরত ডাঃ সাহেবও সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হযরত ডাঃ সাহেবকে সম্বোধন করে আমি বললাম, 'হযরত আব্বাজানের ইন্তেকালের এই মুহূর্তেও আপনার উপস্থিতির কারণে আমরা নিজেদেরকে এতীম ভাবছি না।'

হযরত ডাঃ সাহেব (রাহঃ) তাৎক্ষণিক কোন উত্তর দেননি, ক্ষাণিক ভেবে পরে বললেন, 'তোমাদের এমনটিই ভাবা উচিত। ইনশাআল্লাহ আমি আমার দায়িত্ব যথাযথ আদায় করার চেষ্টা করব।'

তিনি কথাগুলো এমনিভাবে বলেছিলেন যে, পরবর্তী জীবনে তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। যার ফলে আমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা যতই আদায় করি, তা নেহাত নগণ্য বিবেচিত হবে।

চারটি অতি মূল্যবান আমল

একদা হযরত ডাঃ সাহেব (রাহঃ) বললেন, 'আগের যুগে ইছলাহে নফ্স বা আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য অনেক বেশী মেহনত-মোজাহাদা করতে হত। কিন্তু এ যুগের মানুষের হিম্মত নেই সেই পরিমাণ মেহনত-মোজাহাদা করার। তাই আমি আপনাদেরকে একটি অতি সজহ ব্যবস্থাপত্র বাতলে দিচ্ছি, যা খুবই সংক্ষিপ্ত কিন্তু দ্রুত ক্রিয়াশীল। সেই ব্যবস্থাপত্রটি হল চারটি আমলের সমষ্টি। যে চারটি আমল শরীয়ত এবং তরীকতের প্রাণবস্তু এবং তা এতই সহজ যে জানমাল এবং সময় কিছুই এতে ব্যয় করতে হয় না। মানুষ যদি এর অভ্যাস করে নেয়, তাহলে আল্লাহর সাথে তার এক বিশেষ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যায়। যার সুফল জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সে অনুভব করে। অন্তরের অবস্থা পরিবর্তন হতে থাকে। এর পর ধীরে ধীরে তার সেই মাকাম বা মর্তবা অর্জিত হয়ে যায়, যে মর্তবা অর্জিত হলে মানুষ ইচ্ছা করলেও গোনাহ করতে সক্ষম হয় না। সেই চারটি আমল হলো ঃ

১. শোকর।

২. সবর বা ধৈর্য।

৩. এস্তেগফার।

৪. এস্তে'আযাহ বা আশ্রয় প্রার্থনা।

(এ প্রসঙ্গে হযরত আরেফী সাহেব (রাহঃ) যা বলেছিলেন, আমার ভাই মাওলানা তকী উসমানী সাহেব তা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। 'মা'মূলাতে ইয়াওমিয়্যাহ' বা 'প্রতিদিনের আমলসমূহ' নামে এটি পরে কিতাব আকারেও প্রকাশিত হয়েছে এবং সেটা একাধিক ভাষায় অনূদিতও হয়েছে।)

একদিন হযরত বলতে লাগলেন, কি খবর মওলভী রফী! 'মা'মূলাতে ইয়াওমিয়্যাহ' রীতিমত পাঠ কর তো?

আমি আরয করলাম, আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করি।

তিনি বললেন, এর একেকটি অক্ষর পাঠ করবে এবং পড়া শেষ হয়ে গেলে পুনরায় পড়া আরম্ভ করবে।

অত:পর তিনি মুচকি হেসে বলেন, আসলে এই কিতাবটি আমি লেখিছিই তোমাদের দুই ভায়ের জন্য। আমার ভয় হচ্ছে যে, সমগ্র দুনিয়াবাসী এর দ্বারা উপকৃত হবে আর তোমরা দু'জন তা ভুলে বসবে। অত:পর তিনি নিজের জীবনের একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বল্লেন, একদা আমার মুরশিদ হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রাহঃ) আমাকে একটি মধুর শিশি দিলেন। আমি আনন্দের আতিশয্যে সেটা ঘরে এনে এই ভেবে সযতনে রেখে দিলাম যে, এত বড় তাবার্‌রুক যদি এমনিই খেয়ে ফেলি, তাহলে তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং এটা যত্নসহকারে রেখে দেয়াই যুক্তিসঙ্গত হবে। এরপর বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে অল্প অল্প করে খেয়ে নিব। অতএব আমি সেটা অত্যন্ত যত্নের সাথে সংরক্ষণ করে রেখে দিলাম। এরপর কয়েক মাস অতিবাহিত হয়ে গেল। একদিন রোযা রেখেছিলাম ভাবলাম সেই বরকতময় মধু দিয়ে ইফতার করব। ইফতারের সময় হলে শিশি খুলে দেখি পূরা শিশিতে বড় বড় পিপিলীকা ঢুকে রয়েছে, সেখানে মধুর কোন নাম-চিহ্ন নেই। সুতরাং এই 'মা'মূলাতে ইয়াওমিয়্যা'র ব্যাপারেও আমার এই আশংকা হচ্ছে যে, লোকেরা এর দ্বারা উপকৃত হবে আর তোমরা একে পরম যত্নে রেখে দিবে।

মুরশিদের তোহ্ফা

এখন আমি আপনাদের সম্মুখে আমার মুরশিদের সেই তোহ্ফা পেশ করছি, যা তিনি চৌদ্দ বছরের সম্পর্কের পর প্রদান করেছেন। আশা করি আপনারা তার যথাযথ মূল্যায়ন করবেন। কেননা আমার মুরশিদ বলেছেন, 'এটা আমার মুরশিদের তোহ্ফা'। আর তাঁদের মুরশিদগণ বলতেন, এটা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রদানকৃত তোহ্ফা এবং অধিকাংশ সময় বলতেন যে, শোকর, সবর, এস্তেগফার, এস্তে'আযাহ বা প্রার্থনা;. এই চারটি বিষয়কে তোমরা অভ্যাস বানিয়ে ফেল।

শোকর

সর্বপ্রথম বিষয় হলো শোকর। প্রথমেই এটার অভ্যাস করা উচিত। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে এবং রাতের বেলা ঘুমুতে যাওয়ার পূর্বে নিজের অস্তিত্ব এবং আশ-পাশের প্রতি হালকা দৃষ্টি বুলিয়ে মহান আল্লাহর দানকৃত অসংখ্য অগণিত নেয়ামতসমূহের ধ্যান করে সংক্ষিপ্তসারে শোকর আদায় করবে। বিশেষ করে ঈমানের যে মহান দৌলত আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে প্রদান করেছেন এবং প্রদান করেছেন সুস্থতা এবং শান্তি-নিরাপত্তা। মনে মনে এ সকল ব্যাপারে শোকর আদায় করবে এবং এ সকল নেয়ামত সঠিকভাবে ব্যবহারের দৃঢ় বাসনা মনে রাখবে। এ ছাড়া যে সকল নেয়ামতের কথাই স্মরণ আসবে, সাথে সাথে চুপিসারে তার শোকর আদায় করে নিবে। অর্থাৎ যখনি নিজের ইচ্ছার প্রতিকুলে কোন কাজ তোমাদের সমাধা হবে, যার দ্বারা তোমার মনে স্বস্তি ও শান্তি আসবে, তখন সাথে সাথে চুপিসারে বলে নিবে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ 'আলহামদু লিল্লাহ' অথবা اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ 'আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু ওয়ালাকাশ্ শুকরি' হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা আপনার জন্য।

শোকরের স্থানসমূহ

সকাল থেকে নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত মানুষের হাজারো কাজ এমন সংঘটিত হয়, যা মানুষের ইচ্ছার অনুকুলে সমাধা হয়। সকাল বেলা চক্ষু খোলার পরই যদি দেখ শরীর-স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ ঠিক, তাহলে বলে নাও 'আলহামদুলিল্লাহ'। তারপর পরিবারের অন্যদের শরীর-স্বাস্থ্যও দেখলে ঠিক আছে, তাহলেও চুপিসারে বলে ফেল 'আলহামদুলিল্লাহ'। ওযূ করে ফজরের নামাযের জন্য মসজিদে রওয়ানা হলে এবং মসজিদে গিয়ে জামাত পেয়ে গেলে, তাহলে বলো 'আলহামদুলিল্লাহ'। সকাল বেলা নাস্তা মিলে গেল তো 'আলহামদুলিল্লাহ'। সকাল বেলা কাজে রওয়ানা হলে, হতে পারে কোন কারণে পথে বিলম্ব হয়ে গেল। যদি যথাসময়ে কাজে পৌছতে সক্ষম হলে, তাহলে বলো 'আলহামদুলিল্লাহ'। যারা বাসে চড়ে কর্মক্ষেত্রে পৌছে, তাদের নানারকম সমস্যা হতে পারে যথা বাস ঠিকমত পাওয়া না পাওয়া। বাস পেয়ে গেলে 'আলহামদুলিল্লাহ'। বাস পেয়ে গেলেও সিট পাওয়া না পাওয়ার সমস্যা

থেকে যেতে পারে। সিট পেয়ে গেলে 'আলহামদুলিল্লাহ'। কর্মক্ষেত্র থেকে ঘরে পৌছে পরিবারের সকলের হাসিমুখ দেখলে বলো 'আলহামদুলিল্লাহ'। প্রচণ্ড গরমে ঠান্ডা-শীতল বাতাস প্রবাহিত হল, তাহলেও বলো 'আলহামদুলিল্লাহ'। মোটকথা যে কোন কাজই হোক তা ছোট কিংবা বড় অথবা নিজের কোন দোয়া কবুল হয়ে গেলে কিংবা যে কোন কারণেই হোক দিল-মনে শান্তি-স্বস্তি অর্জিত হলে বা কোন মঙ্গলজনক কাজ করার তওফীক হলে, তাতে মনে মনে এবং মুখে আল্লাহর শোকর আদায় করার অভ্যাস করবে। এতে না সময় ব্যয় হয়, না সম্পদ খরচ হয় আব না কোন পরিশ্রম করার প্রয়োজন পড়ে।

অসংখ্য অগণিত নেয়ামত আমরা ভোগ করছি

এমনকি যদি আমরা কোন দুঃখ-কষ্টে পতিত হই, তাহলে তা দূর করার পূর্বে মনে মনে এই চিন্তা করব যে, আল্লাহ তা'আলা চাওয়া এবং প্রার্থনা করা ব্যতীত আমাদের চতুর্পার্শ্বে কত অসংখ্য-অগণিত নেয়ামত প্রদান করে রেখেছেন, যা আত্মার প্রশান্তির কারণ হয়ে আছে। যদি সেগুলো না থাকত, তাহলে আমাদের দুঃখ-কষ্ট কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌছত? এ ধরনের খেয়াল করার দ্বারা ইনশাআল্লাহ বুদ্ধিবৃত্তিক স্বস্তি অর্জিত হবে। যদিও স্বভাবগত বা প্রকৃতিগত কষ্ট-পেরেশানীর প্রতিক্রিয়া তখনও অবশিষ্ট থাকতে পারে। অতির ন ব্যতীত আমরা প্রতিমুহূর্ত আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য অগণিত নেয়ামতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত রয়েছি। যদিও সকল নেয়ামতের শোকর আদায় আমাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়, তথাপি যদি আমরা এভাবে চেষ্টা করি, তাহলে প্রতিটা কাজে শোকর আদায়ের একটা মানিসকতা আমাদের অভ্যাসে পরিণত হবে। যা অন্য কেউ জানতেও পারবে না।

এভাবে একটা অনেক বড় ইবাদত আমাদের দ্বারা আদায় হয়ে যাবে, যার মাঝে রিয়া বা লোক দেখানো মনোভাবও থাকবে না।

এভাবে শোকর আদায়ের দ্বারা নিজের জীবনে কী পরিমাণ উন্নতি সাধিত হবে, তা মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। মোটকথা মানুষের প্রকৃতি এরূপ হওয়া উচিত যে, সে যে অবস্থাতেই থাকুক শোকর আদায় করবে।

প্রথম প্রথম যদিও এটা একটু কঠিন বলে মনে হবে, কিন্তু কিছুদিন অভ্যাস করলে এবং সর্বদা খেয়াল রাখলে, তা মোটেও কঠিন থাকবে না, বরং অভ্যাসে পরিণত হয়ে সহজ হয়ে যাবে।

শোকর দ্বারা নেয়ামত বৃদ্ধি এবং আযাব থেকে নিষ্কৃতি মিলে

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ ○

অর্থ ঃ তোমাদের আযাব দিয়ে আল্লাহ পাক কি করবেন, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক।

এর দ্বারা বুঝা গেল যে সকল ঈমানদার শোকরগোজার হয়, তারা আল্লাহর আযাব থেকে নিরাপদে থাকে। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ ○

অর্থ ঃ যদি তোমরা শোকর আদায় কর, তাহলে তোমাদের নেয়ামত আমি বৃদ্ধি করে দিব।

অর্থাৎ যখনই আমরা নেয়ামতের শোকর আদায় করব, আমাদের নেয়ামত আরো বৃদ্ধি করে দেয়া হবে এবং দুনিয়ার জীবন আরাম এবং শান্তিময় হয়ে যাবে। যদি বিশ্বাস না হয়, তাহলে বাস্তব জীবনে তা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। যে ব্যক্তি নেয়ামতের শোকর আদায় করবে সে স্পষ্ট অনুভব করবে তার জীবনে শান্তিময় এক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে।

শোকর মহান আল্লাহর একটি পছন্দনীয় ইবাদত

শোকর আদায় করা এটা আল্লাহর কত পছন্দনীয় ইবাদত, তা এভাবে অনুমান করা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত ঐশীগ্রন্থসমূহের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং প্রিয়তম গ্রন্থ হলো কুরআনে কারীম। আল্লাহ তা'আলা এই গ্রন্থখানির সূচনা করেছেন সূরায়ে ফাতেহার মাধ্যমে আর সূরায়ে ফাতেহা 'আলহামদুলিল্লাহ' বাক্য দ্বারা শুরু করেছেন। সমগ্র কুরআনের সারনির্যাস হলো সূরায়ে ফাতেহা। আর সূরায়ে ফাতেহার প্রথম বাক্য হলো 'আলহামদুলিল্লাহ'। সুতরাং যে শোকরকে এই পরিমাণ গুরুত্বের সাথে

উল্লেখ করা হল, সেটার মর্যাদা কত অধিক হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। আর সূরায়ে ফাতেহা আল্লাহর নিকট কত পছন্দনীয়, তা এর দ্বারা অনুমান করা যায় যে, এই সূরাকে প্রতি ওয়াক্ত নামাযেই শুধু নয়, বরং নামাযের প্রত্যেক রাকাতে পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর একটা কারণ এও যে, এতে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা-কীর্তন উল্লেখ রয়েছে। আর মহান আল্লাহর নিকট তাঁর নিজের প্রশংসা খুবই পছন্দনীয়।

এই ইবাদতটি জান্নাতেও অব্যাহত থাকবে

জান্নাতে কোন ইবাদত-বন্দেগী থাকবে না, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি যাবতীয় ইবাদত খতম হয়ে যাবে। সেখানে থাকবে শুধু আনন্দ-উল্লাস আর আরাম-আয়েশ কিন্তু একটি ইবাদত সেখানেও অব্যাহত থাকবে, সেটা হল শোকর। হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে যে, জান্নাতবাসীর মুখ থেকে সদা-সর্বদা শুধু মহান আল্লাহর গুণ-কীর্তন অব্যাহত থাকবে। পৃথিবীর বুকে কোন চেষ্টা-মেহনত ব্যতীত যেমন মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস অনবরত জারী থাকে, তেমনিভাবে জান্নাতে অনিচ্ছায় মানুষের মুখে আল্লাহ তা'আলার হামদ-প্রশংসা অব্যাহত থাকবে।

মোটকথা পৃথিবীতে যখন এটা মানুষের অভ্যাস হয়ে যাবে যে, ছোট বড় প্রতিটা নেয়ামতের উপর আল্লাহর শোকর আদায় করতে থাকবে, তখন আল্লাহর আযাব থেকে সে মুক্তি পাবে, তার নেয়ামত বৃদ্ধি করে দেয়া হবে, আল্লাহর মহাব্বত অন্তরে সৃষ্টি হবে, আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক কায়েম হবে এবং তাঁর নৈকট্য লাভ হবে। ফলে জীবনে এক ধরনের সুখময় পরিবর্তন সাধিত হবে, অল্পতুষ্টির স্বাদ অনুভব করবে এবং জীবন খুবই আনন্দ ও স্বস্তিময় হবে।

এক কাঠুরিয়ার ঘটনা

হযরত সুলাইমান আলাইহিস্ সালামের সিংহাসন, যা কোন রাজা বাদশাহদের সৌভাগ্য হয়নি। যে সিংহাসনকে জ্বিনেরা বাতাসে বহন করে নিয়ে যেত। তার উপর পাখীরা ছায়া প্রদান করত এবং অসংখ্য অগণিত সৃষ্টজীব তার সাথে চলত। এমনিরূপ জাঁকজমকের সাথে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের সিংহাসন একদা এক জংগলের উপর দিয়ে উড়ে

চলছিল। সে জংগলে এক কাঠুরিয়া কাঠ কাটতেছিল, সুলাইমান আলাইহিস সালামের এই জাঁকজমকপূর্ণ সিংহাসন দেখলে তার মুখ থকে অনিচ্ছায় বেরিয়ে এল, 'সুবহানাল্লাহ! সুলাইমান এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীগণের কতই না শান-শওকত!'

বাতাস তৎক্ষণাত হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের নিকট কাঠুরিয়ার এই উক্তিটি পৌছে দিল। হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম সিংহাসন নিচে নামানোর নির্দেশ প্রদান করলেন এবং বললেন, সেই কাঠুরিয়ার নিকট সিংহাসন নিয়ে চল। কাঠুরিয়া সুলাইমান আলাইহিস সালামকে দেখে ধরধর করে কাঁপতে লাগল। সে ভাবছে, না জানি কোন অপরাধ আমার দ্বারা হয়ে গেলে।

সুলাইমান আলাইহিস সালাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বলেছিলে?

বেচারা কাঠুরিয়াতো ভয়ে তার বলা বাক্যটি ভুলেই গিয়েছিল। কিছুক্ষণ ভাবার পর সে বলল, জনাব! আমিতো শুধু এটুকুই বলেছি যে, 'সুবহানাল্লাহ! সুলাইমান এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীগণের কতই না শান-শওকত!'

হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম কাঠুরিয়াকে বললেন, সুলাইমান এবং তাঁর বাহিনী দেখে তোমার ঈর্ষা হল অথচ তোমার এ কথা জানা নেই যে, তুমি যে 'সুবহানাল্লাহ' শব্দটি বলেছ, তার সম্মুখে এমন হাজারো সুলাইমান বাহিনী অতি নগণ্য ও তুচ্ছ। তোমার জানা নেই যে একবার 'সুবহানাল্লাহ' বলার দ্বারা তোমার মর্যাদা কত উচ্চে কত উর্দ্ধে উঠে গেছে।

শোকর দ্বারা সবর এবং তাকওয়া সৃষ্টি হয়

আল্লাহ পাকের শোকর একটি অনেক বড় দৌলত, যার দ্বারা সীমাহীন শান্তি এবং অসংখ্য নেয়ামত লাভ হয়। যখন মানুষ সদা-সর্বদা প্রতিটা কাজে শোকর আদায় করবে, তখন এর দ্বারা সবর বা ধৈর্যের জয্বা সৃষ্টি হবে ফলে যে কোন দুঃখ কষ্টে প্রশ্ন-অভিযোগ উত্থাপন করবে না। গোনাহ করতে লজ্জা অনুভূত হবে এই ভেবে যে, সকাল-সন্ধ্যা যার শোকর আদায় করছি, এখন তাঁর নাফরমানী করি কিভাবে! সুতরাং এটাও একটা বিরাট ব্যাপার যে, শোকরগোজার ব্যক্তির দ্বারা গোনাহ অনেক কম সংঘটিত হয়। অহংকার, লোভ-লালসা, অপব্যয়, কৃপণতা প্রভৃতি ধ্বংসাত্মক আত্মিক ব্যাধিসমূহ থেকে শোকরগোজার ব্যক্তি নিরাপদে থাকে।

শোকর অহংকার দূরিভূত করে

শোকরের একটা বিরাট লাভ হলো এর ফলে মানুষ তাকাব্বুর বা অহংকার থেকে নিরাপদে থাকে। কারণ যত অধিক নেয়ামতই তার অর্জিত হোক না কেন, সেগুলোকে সে নিজের কোন কৃতিত্ব বলে মনে করে না, বরং মহান আল্লাহর দান বলে মনে করে এবং এর স্বীকারও করে। সুতরাং যখন নিজের কোন বৈশিষ্ট্যই তার নিকট থাকবে না, বরং সকল কিছুকে আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করবে, তখন আত্মম্ভরিতা আর বাবুয়ানা কিসের উপর প্রকাশ পাবে? আর অহংকার এমন ভয়ানক ও ধ্বংসাত্মক গোনাহে কবীরা, যার সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ

অর্থ ঃ ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে না, যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার রয়েছে।

সবর

এ পর্যন্ত একটি আমল অর্থাৎ শোকরের আলোচনা শেষ হল এবার দ্বিতীয় আমল অর্থাৎ সবর সম্পর্কে আরয করতে চাই। সবর বলা হয় নিজের মর্জি বিরোধী কোন কাজ হয়ে গেলে, সে ক্ষেত্রে কোন না জায়েয পদক্ষেপ থেকে নিজেকে বিরত রাখা। যথা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিজের ইচ্ছা বা মর্জির অনুকূলে যেমন অসংখ্য কাজ সংঘটিত হয়, তদ্রূপ নিজের মর্জির বাইরেও অনেক কাজ সংঘটিত হয়। যেমন কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার জন্যে বাস ষ্টেশনে পৌছলেন, কিন্তু বাস পেলেন না। মোটকথা নিজের মর্জির বাইরে যে কোন ছোটখাট ঘটনাই হোক বা বড় কোন ঘটনা হোক, সে ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুমের প্রতি দৃষ্টি রাখবে। নিজেকে সীমার বাইরে যেতে কোন অবস্থাতেই দিবে না। এরই নামা সবর এবং এটা আত্মার অনেক বড় আমল। এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বান্দার ঈমানী শক্তির পরীক্ষা নেয়া হয়। জীবন চলার পথে, দিবা রাতে আমরা কতই না বিপদাপদ,

বালা-মসীবতের সম্মুখিন হয়ে থাকি, এমন কত বিষয়ই আমাদের সম্মুখে ঘটে যা আমাদের জন্য খুবই কষ্টকর প্রমাণিত হয়, মনে দারুন কষ্ট ও ব্যথা পাই। কখনও নিজের কখনও নিকটতম আত্মীয়-স্বজনের, কখনও প্রিয়তম বন্ধুর রোগ-বিমারে, দুঃখ-কষ্টে কিংবা মৃত্যুতে আমরা শোকাহত হই, দুঃখিত হই। অথবা কখনও নিজের নেতৃত্ব বা কতৃত্ব হারিয়ে মনোকষ্টের শিকার হই, কখনও ব্যবসায়ীকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে মানসিক অশান্তিতে ভুগি; মোটকথা দিল-মনে কষ্ট আনয়নকারী যত বিষয় রয়েছে, তা সবই সবরের জন্য পরীক্ষা। কিন্তু যেহেতু এ সবই নিজের ইচ্ছার বাইরে হয়, সেহেতু এসবই আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়ার বিশ্বাস রাখা ওয়াজিব। কেননা বাহ্যত: এসবের দ্বারা দুঃখ-কষ্ট আর পেরেশানী হলেও এতে মানুষের জন্য মঙ্গল ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে এবং নিহিত রয়েছে মহান আল্লাহর হেকমত বা রহস্য। এ সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে বান্দার আত্মার প্রশান্তির জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসু এবং ক্রিয়াশীল প্রতিষেধক দিয়ে দিয়েছেন। যে কোন কষ্ট-মসীবতে পতিত হলেই মানুষ পাঠ করবে ঃ

إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ○

অর্থ ঃ নিশ্চয় আমি আল্লাহর এবং তাঁরই দিকে আমি ফিরে যাব।

এর দ্বারা মানসিক এবং শারীরিক উভয় ক্ষেত্রেই সহনশক্তি অর্জিত হবে। মোটকথা নিজের মর্জির বাইরে যে কোন বিষয় ঘটে গেলে বা কোন দুঃখ-কষ্টে পতিত হলে সাথে সাথে إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ পড়ে নেয়া সবরের একান্ত সহজ পদ্ধতি। এতেও কোন পরিশ্রম, অর্থ ব্যয় বা সময়ের প্রয়োজন পড়ে না। আর আমাদের দেশে তো বিদ্যুতের লোডশেডিং এ কাজকে আরো সহজ করে দিয়েছে। বিদ্যুৎ যখনি লোডশেডিং খেলা শুরু করে এবং যতবার তা চলে যায় সাথে সাথে إِنَّا لِلَّٰهِ পড়ে নিবে। আর যখন আসবে তখন اَلْحَمْدُ لِلَّٰهِ বলে নিবে। এর দ্বারা সবর ও ধৈর্য উভয়ের সওয়াব পেয়ে যাবে।

হাদীসের এক বর্ণনায় এ পর্যন্ত উল্লেখ রয়েছে যে, যদি কারো অতীতের কোন দুঃখজনক ঘটনা স্মরণ আসে এবং এর দ্বারা মনে কষ্ট অনুভূত হয় তাহলেও إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ পড়ার দ্বারা সে পরিমাণ সওয়াব সে পাবে, যে পরিমাণ সওয়াব ঘটনা ঘটার সময় পেয়েছিল।

'ইন্নালিল্লাহ' বাক্যটি শুধু মৃত্যুর সাথেই সম্পর্কযুক্ত নয়

আমাদের সমাজে সাধারণ্যে এই ধারণাটি প্রচলিত রয়েছে যে, 'ইন্নালিল্লাহ'র বাক্যটি শুধু তখনই পড়া হয়, যখন কোন মানুষ মারা যায়। অথচ এই বাক্যটি শুধু মৃত্যুর সাথেই সম্পর্কযুক্ত করে নেয়া ঠিক নয়।

বর্ণনায় এসেছে একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে একটি বাতি জ্বলতে জ্বলতে হঠাৎ নিভে গেলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়লেন إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটাও কি কোন মসীবত! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হাঁ। বরং যার দ্বারাই মুসলমানের কোন কষ্ট হবে, সেটাই মসীবত এবং এর দৌলতে সওয়াবের ওয়াদা রয়েছে।

অন্য এক হাদীসে রয়েছে 'মুসলমানের পায়ে যদি একটি কাটাও ফুটে, এর দ্বারাও তার সওয়াব মিলে'।

অন্য এক হাদীসে এসেছে, 'মুমিনের সর্বাবস্থায় সফলতা রয়েছে। কারণ সন্তোষজনক কোন কিছু পেয়ে সে শোকর আদায় করে পক্ষান্তরে কোন বিপদে পতিত হলে সে ধৈর্যধারণ করে'। আর আল্লাহ তা'আলা শোকর আদায়কারী এবং ধৈর্যধারণকারী উভয়কে ভালবাসেন।

মোল্লা নাসিরুদ্দীনের ঘটনা

মোল্লা নাসিরুদ্দীনের ঘটনা মনে পড়ে গেল। মোল্লা নাসিরুদ্দীন অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা করা হয় যে, তিনি খুবই সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন আর তাঁর স্ত্রী ছিলেন খুবই বদ আকৃতির অধিকারী। মোল্লা নাসিরুদ্দীন একদা স্ত্রীকে বললেন, তুমিও জান্নাতী আমি জান্নাতী। স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, তা কিভাবে জানতে পারলেন? মোল্লাজী জবাব দিলেন, এ জন্য যে, তুমি যখন আমাকে দেখ তখন তুমি শোকর আদায় কর এই ভেবে যে, আল্লাহ তা'আলা আমার ন্যায় কুশ্রী নারীকেও কত সুন্দর স্বামী দিয়েছেন।

পক্ষান্তরে আমি যখন তোমাকে দেখি, তখন আমি ধৈর্যধারণ করি। আর শোকর আদায়কারী এবং ধৈর্যধারণকারী উভয়ই জান্নাতে যাবে।

ধৈর্যধারণকারীর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়

মোটকথা প্রত্যেক ছোট-বড় মর্জিবিরোধী বিষয়ের উপর ধৈর্যধারণ করা উচিত এবং 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন' পড়া উচিত। কেননা সবর বা ধৈর্যধারণ করার দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

অর্থ ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যধারণকারীদের সাথে রয়েছেন।

(সূরা বাকারা, আয়াত ১৫৩)

আল্লাহর নৈকট্য যাদের লাভ হবে, এ পৃথিবীতে তাদের ক্ষতি করার সাধ্য কার রয়েছে? আর যারা দুঃখ-কষ্ট বা মসীবতে পতিত হয়ে 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন' পড়ে, তাদের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা হল ঃ

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ۝

অর্থাৎ এ ধরনের লোকদের উপর আল্লাহর সাধারণ এবং বিশেষ উভয় প্রকার রহমত বর্ষিত হয় এবং এরাই হেদায়েতপ্রাপ্ত।

মোটকথা সবর বা ধৈর্য ধরার স্থানে এই বাক্যটি বলার দ্বারা এটা স্পষ্ট অনুভূত হবে যে, আল্লাহর রহমতের অংশীদার হচ্ছে। আর আমি এ কথা কসম দিয়ে বলছি যে, কোন মানুষ যদি এই চারটি আমলের অভ্যাস করে নেয়, তাহলে সে কিছু দিনের মধ্যেই তার মন-মানসে এক বিশেষ প্রশান্তি অনুভব করবে এবং তার মনে হবে কে যেন তাকে সার্বক্ষণিক নেগরানী করছে। ফলে একাকিত্বের কষ্ট দূর হয়ে জীবনে এক বিশেষ স্বাদ অনুভব করবে। এই আমলের ফলে সত্যের উপর দৃঢ়পদতা ও সহনশীলতা সৃষ্টি হবে। যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার মত শক্তি-সামর্থ সৃষ্টি হবে। মহান আল্লাহর যে কোন ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকার তওফীক হবে, যা

মুমিন জীবনের অনেক উচ্চতর সোপান। ধৈর্যধারণকারীর মনে কখনও নিজের ব্যাপারে কারো থেকে প্রতিশোধ নেয়ার স্পৃহা জাগ্রত হয় না বা হলেও তা খুব তাড়াতাড়ি অবদমিত হয়ে যায়। ফলে সে অনেক ফেৎনা থেকে বেঁচে থাকতে সক্ষম হয়।

এস্তেগফার

তৃতীয় আমল হলো এস্তেগফার। এই আমলটিতেও জান মাল বা খুব বেশী সময় ব্যয়ের প্রয়োজন পড়ে না। যখনই কোন গোনাহ সংঘটিত হয়ে যায়, চাই তা বড় হোক বা ছোট সাথে সাথে পড়ে নিবে أَسْتَغْفِرُ اللَّه অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি।'

শয়তানের চ্যালেঞ্জ

হযরত আদম আলাইহিস সালামকে যখন পৃথিবীতে পাঠানো হচ্ছিল, তখন তাঁকে পাঠানোর পূর্বেই শয়তান এই চ্যালেঞ্জ করে এসেছে যে, হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দাদেরকে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট করব এবং জাহান্নামে পৌছিয়ে ছাড়ব। কেননা এই আদম সন্তান আমার শত্রু, যাদের কারণে আমি আমার অনেক বড় ও মর্যাদাকর অবস্থান থেকে বিতাড়িত হয়েছি।

হযরত আদম আলাইহিস সালাম আল্লাহর নিকট আরয করলেন, হে আল্লাহ! আপনি আমার দুশমন শয়তানকে এই পরিমাণ শক্তি প্রদান করেছেন, যে পরিমাণ শক্তি আমার এবং আমার সন্তানদের মাঝে নেই। সে বিভিন্ন আকার আকৃতি ধারণ করতে পারে এবং সে এমন পন্থায় আমাদের নিকট আগমন করে যে, তাকে আমরা দেখি না অথচ সে আমাদেরকে দেখে। সে জ্বিন জাতির অন্তর্ভুক্ত আর আমরা মানুষ। তার এবং আমাদের মাঝে বৈশিষ্ট্যগত অনেক পার্থক্য। সুতরাং সে তো আমাদেরকে জাহান্নামে পৌছিয়ে ছাড়বে।

আল্লাহর দেয়া হাতিয়ার

আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে আদম! আমি শয়তানকে যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি প্রদান করেছি একথা সত্য, তবে তার এই শক্তির সাথে মোকাবেলা করার জন্য তোমাদেরকে একটি হাতিয়ার দিয়ে দিচ্ছি। যতক্ষণ পর্যন্ত

তোমরা এই হাতিয়ার ব্যবহার করতে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত শয়তানের কোন শক্তি বা আক্রমন তোমাদের পরাজয় করতে পারবে না। সে হাতিয়ারের নাম হলো, এস্তেগফার। অর্থাৎ যখনই কোন অন্যায় অপরাধ তোমাদের দ্বারা সংঘটিত হয়ে যাবে, তৎক্ষণাত মনে মনে পড়ে নিবে أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ 'আস্তাগফিরুল্লাহ'।

এস্তেগফার দ্বারা গোনাহ মাফ হয়

যারা এস্তেগফার করে, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর আযাব দেন না। সুতরাং পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝

অর্থ ঃ তারা যতক্ষণ পর্যন্ত প্রার্থনা করতে থাকবে, আল্লাহ কখনও তাদের উপর আযাব দিবেন না। (সূরা আনফাল ঃ আয়াত ৩৩)

আল্লাহ তা'আলা আমাদের অন্তরে গোনাহের আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং গোনাহের মাঝে স্বাদও রেখে দিয়েছেন। গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা খুব সহজ নয়। মানুষ অনিচ্ছায় এতে জড়িয়ে পড়ে। এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য এমন প্রশস্ত দরজা খুলে রেখেছেন যে, যদি কখনও আমাদের দ্বারা গোনাহ হয়ে যায়, তাহলে লজ্জিত, অনুশোচিত হয়ে এস্তেগফার করে নিলে গোনাহ মাফ হয়ে যাবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَّا ذَنْبَ لَهٗ

অর্থ ঃ গোনাহ থেকে তাওবাকারীর অবস্থা ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যার কোন গোনাহ নেই।

যতবার গোনাহ হবে ততবার তাওবা করে নিবে

একবার গোনাহ হয়ে যাওয়ার পর তাওবা করে নিলে আবার সেই একই গোনাহ যদি দ্বিতীয় বার সংঘটিত হয়ে যায়, তাহলে পুনরায় তাওবা করে নিবে। আল্লাহ তা'আলা মাফ করে দিবেন। এমনকি যদি একই গোনাহ সত্তর বারও হয়ে যায় এবং প্রতিবার ক্ষমা চাওয়া হয়, তাহলে প্রতিবারই ক্ষমা করা হবে। কেননা তাওবার দরজা সর্বদার জন্য উন্মুক্ত। সুতরাং যদি হাজার বারও

তাওবা ভেঙ্গে যায়, তাহলেও আবার তাওবা করে নিবে। দয়াময়, করুণার আধার রাব্বুল আলামীন ক্ষমা করে দিবেন। জনৈক কবি অত্যন্ত চমৎকার একটি কবিতা আবৃতি করেছেন, যার দ্বারা এ বিষয়টি পরিষ্কার বুঝে আসে ঃ

جام مرا توبہ شکن، توبہ مری جام شکن
سامنے ڈھیر ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے

অর্থাৎ শরাবের পেয়ালা ভেঙ্গে দেয় আমার তাওবা
তাওবাও ভেঙ্গে দেয় আমার শরাবের পেয়ালা
আমার সম্মুখে আজি ভাঙ্গাভঙ্গির টুকরোগুলো
স্তুপাকারে জমে আছে।

'পায়মানো' 'পায়মান' এবং 'পায়মানাহ' উভয়ের বহুবচন। 'পায়মান' বলা হয় ওয়াদা বা অঙ্গীকারকে। আর তাওবাও এক প্রকার ওয়াদা। কারণ তাওবার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে এই অঙ্গীকার করা হয় যে, ভবিষ্যতে আর এই গোনাহ করব না। পায়মানাহ শরাবের পেয়ালাকে বলা হয়। শরাবের পেয়ালাকে জামও বলা হয়। এখানে কবি বলতে চায় শরাবের পেয়ালা আমার তাওবা ভঙ্গকারী অর্থাৎ আমার তাওবা ভেঙ্গে দেয়। আমাকে শরাব পানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এবং আমি শরাব পান করে ফেলি। ফলে আমার তাওবা ভেঙ্গে যায়। কিন্তু আমার তাওবাও শরাবের পেয়ালা ভঙ্গকারী। অর্থাৎ আমার থেকে শরাবের পেয়ালাকে দূরে সরিয়ে দেয়। আমি তাওবা করি এবং শরাবের পেয়ালা ভেঙ্গে ফেলি। এভাবে আমার ভাঙ্গাভাঙ্গির ধারাবাহিকতা চলছে। কখনও শরাবের পেয়ালা অর্থাৎ 'পায়মানাহ' আমার তাওবা অর্থাৎ 'পায়মান'কে ভেঙ্গে দেয়, কখনও তাওবা পায়মানাহ অর্থাৎ শরাবের পেয়ালাকে ভেঙ্গে দেয়। মোটকথা পায়মান ভেঙ্গে দেয় পায়মানাহকে, আবার পায়মানাহ ভেঙ্গে দেয় পায়মানকে। এভাবে ভাঙ্গাভাঙ্গির খেলা চলছে। যদি এ অবস্থায় মৃত্যু এসে যায় যে, তাওবা শরাবের পেয়ালাকে ভেঙ্গে দিয়েছে, তাহলেতো সফল অর্থাৎ গোনাহ হয়ে যাওয়ার পর তাওবা করে নিল আবার গোনাহ হয়ে গেল আবার তাওবা করে নিল। এমনিভাবে প্রতিটা গোনাহের পর তাওবা করতে থাকল, আর গোনাহও মাফ হতে থাকল।

গোনাহের হাকীকত এটাই যে, যে গোনাহ হয়ে গেলে, তার উপর অনুতপ্ত এবং লজ্জিত হবে এবং ভবিষ্যতে তা না করার দৃঢ় অঙ্গীকার করবে। এমনিভাবে তাওবা করতে পারলে সকল গোনাহ মাফ হয়ে যেতে বাধ্য। তবে যে সকল হক মানুষের সাথে সম্পৃক্ত সেগুলো শুধু তাওবা দ্বারা মাফ হবে না, যতক্ষণ না হকদার মাফ না করবে কিংবা হকদারের হক আদায় না করবে।

এস্তেগফারের ফায়দা

এস্তেগফারের অনেক ফায়দা রয়েছে। এস্তেগফার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইবাদত। এস্তেগফার গোনাহ হলো মাফ এবং মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম। বার বার এস্তেগফার করার দ্বারা এক পর্যায়ে গোনাহ করতে লজ্জা অনুভূত হবে। এস্তেগফার দ্বারা আল্লাহর রহমত সীমাহীন দয়া ও অনুগ্রহের পরিমাপ করা যায় এভাবে যে, আমি কী পরিমাণ গোনাহ করছি, আর তিনি আমাকে কতবার ক্ষমা করে যাচ্ছেন। যার অন্তরে সর্বদা নিজের ভুল-ত্রুটির অনুভব এবং পাপাচারের প্রতি লজ্জা সৃষ্টি হবে, তার মনে কখনও অহংকার এবং বড়ত্ব জন্ম নিতে পারে না। কেননা যতবেশী সে ইবাদতে মনোনিবেশ করবে, তার চেয়ে অধিক তার গোনাহের কথা স্মরণ আসবে।

মোটকথা এস্তেগফারও এমন একটি আমল, যার জন্য কোন সময় নির্ধারণ করার প্রয়োজন নেই, বরং প্রতিনিয়ত এর প্রয়োজন পড়ে। কেননা একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন কত পরিমাণ গোনাহ আমাদের জ্ঞাতে আর কী পরিমাণ গোনাহ আমাদের অজ্ঞাতে সংঘটিত হচ্ছে। এমন গোনাহও আমাদের দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে, যার কল্পনাও আমরা কখনও করিনি কিংবা যাকে আমরা গোনাহ বলেই মনে করিনি। এ জাতীয় সকল অবস্থায় যখনই স্মরণে আসবে সাথে সাথে দিল-মনে অত্যন্ত অনুশোচনা ও মিনতির সাথে আল্লাহ তা'আলার দিকে রুজু হয়ে যাবে এবং মুখে এস্তেগফার পাঠ করবে। বলবে, হে আল্লাহ! আমি অত্যন্ত লজ্জিত এবং অনুতপ্ত! আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের অন্যায় ও পাপাচার থেকে আমাকে রক্ষা কর।

এটা এমন একটা আমল, যার দ্বারা বান্দার উপর মহান আল্লাহর পরিপূর্ণ রহমতের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। এর দ্বারা আত্মার অনুশোচনার সাথে সাথে বিশ্বাসের অনুভূতি সৃষ্টি হয়। ঈমান সংরক্ষিত থাকে। তাকওয়ার দৌলত অর্জন হয়। এমন ব্যক্তির দ্বারা জানা সত্ত্বে গোনাহ সংঘটিত হয় না। হলেও কদাচিৎ। এমন ব্যক্তির দ্বারা আল্লাহর সৃষ্টজীবের কোন ক্ষতি সাধিত হয় না।

মহান আল্লাহ শুধুই স্বীয় অনুগ্রহে নিজের গোনাহগার বান্দাদের ইহলৌকিক সফলতা ও পারলৌকিক মুক্তির জন্য তাওবা-এস্তেগফারকে ওসীলা হিসেবে প্রদান করে অনেক বড় এহসান করেছেন فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ, সুতরাং সকল প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা একমাত্র আল্লাহর জন্য।

বুযুর্গগণ বলেছেন, নিজের অতীত জীবনের সকল গোনাহ চাই তা সগীরা হোক চাই কবীরা যথাসম্ভব স্মরণ করে আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'চার বার অত্যন্ত একনিষ্ঠতার সাথে, অনুতপ্ত হয়ে, মিনতির সাথে তাওবা-এস্তেগফার করে নাও। ব্যাস! এর দ্বারা ইনশাআল্লাহ সকল গোনাহ মাফ হয়ে যাবে। ভবিষ্যতে তা বারবার স্মরণ করার চেষ্টা করে দুশ্চিন্তায় লিপ্ত হবে না। তবে যদি কখনও কোন গোনাহের কথা অনিচ্ছায় স্মরণে এসে যায়, তাহলে চুপিসারে এস্তেগফার পড়ে নিবে। তবে মানুষের যে সকল হক রয়ে গেছে, সেগুলো যেভাবেই হোক আদায় করে দেয়া বা মাফ করিয়ে নেয়া ফরজ এবং ওয়াজিব।

এস্তে'আযাহ

চতুর্থ আমল 'এস্তে'আযাহ'। এস্তে'আযাহ অর্থ হলো আশ্রয় প্রার্থনা করা। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত শুরু করার পূর্বে আমরা 'আ'উযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম' পড়ে থাকি। যার অর্থ হলো, 'আমি বিতাড়িত এবং অভিশপ্ত ইবলীস থেকে মহান আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি'। আমাদের এই আমলটিও এস্তে'আযাহ-এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা এর সারমর্ম এটাই যে 'হে আল্লাহ! আমাকে শয়তানের অনিষ্ট থেকে আপনি রক্ষা করুন'।

পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের পূর্বে 'আ'উযুবিল্লাহ' পড়া একান্ত আবশ্যক, যা স্বয়ং পবিত্র কুরআনেই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

যে কোন ভয়-শংকায় 'আ'উযুবিল্লাহ' পড়বে

দুনিয়ার জীবনে আমরা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখিন হয়ে থাকি এবং অহর্নিশ আমাদের প্রবৃত্তি এবং শয়তানের সাথে মোকাবেলা করে চলতে হয়। এ জন্য আমাদের সকল বিষয়ে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। মানুষের সাথে লেন-দেন, উঠা-বসা, আচার-আচরণ করতে যেয়ে আমরা কখনও কখনও এমন পরিস্থিতির শিকার হই, যা ভবিষ্যতে আমাদের জন্য অনেক অকল্যাণ ডেকে আনে, যার কোন সমাধান তখন আর খুঁজে বের করা সম্ভব হয় না এবং পরিস্থিতির লাগাম তখন নিজের আয়ত্তের ভিতরও থাকে না। এমনি সংকটপূর্ণ মুহূর্তে নিজের প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করলে দিল-মনে যথেষ্ট স্বস্তি ফিরে আসে। সুতরাং এর অভ্যাস করা উচিত। যখনই এ জাতীয় কোন সমস্যা সম্মুখে আসে সাথে সাথে মনের গভীর থেকে বলে নেয়া উচিত اَعُوْذُ بِاللّٰهِ আমি মহান আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মানুষের অসংখ্য সমস্যা-সংকট দেখা দিতে পারে। আগামী কাল কার কিভাবে দিবসটি অতিবাহিত হবে, তা কেউ বলতে পারে না। চাকুরী বহাল থাকবে কি থাকবে না। কোথাও কোন ঘটনায় নিজের ইয্যত সম্মানের হানী হবে কি না। পথ চলতে কোন দুশমন বা ছিনতাইকারী আক্রমন করে বসে কি না। ব্যবসায় অস্বাভাবিক ধরনের কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যায় কি না। অনেক দিনের পুরাতন রোগটা দেখা দেয় কি না বা নতুন কোন রোগ মাথাচারা দিয়ে উঠে কি না কিংবা স্বয়ং মালাকুল মওতই এসে উপস্থিত হয় কি না––ইত্যাদি ইত্যাদি।

পৃথিবীর এমন কোন মানুষ নেই, যে এ সকল সমস্যাগুলো কাধে নিয়ে জীবন গুজরান করছে না। সুতরাং দুনিয়া আখেরাতের সকল ভয়-শংকা থেকে নিরাপদে থাকার মাধ্যম হলো এই মহান ইবাদত এস্তে'আযাহ। যখনই মনে কোন ওসওয়াসা বা শংকা সৃষ্টি হয়, সাথে সাথে চুপিসারে বলে নিবে 'আ'উযুবিল্লাহ' হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যদি আরবী শব্দটি উচ্চারণ করতে কেউ অক্ষমও হয়, তথাপি নিজের মাতৃভাষায়ও তা বলে নিতে পারে।

যে ব্যক্তি যত বেশী ধন-সম্পদের অধিকারী বা যত বড় পদের অধিকারী, তার সমস্যা বা বিপদও তত বেশী। আর যে ব্যক্তি বেশী ধন-সম্পদেরও অধিকারী নয়, পদ মর্যাদারও অধিকারী নয়, তার সমস্যা বা বিপদাপদও তত কম।

এক চোরের অসহায়ত্ব

এক চোর চুরির উদ্দেশ্যে এক ঘরে ঢুকেছে। পূরা ঘরে তন্ন তন্ন করে খুঁজে চুরি করার মত সে কিছুই পেল না। আসলে সে ঘরে চুরি করার মত টাকা পয়সা অর্থ-সম্পদ, কাপড়-চোপড়, থালাবাটি ইত্যাদি কিছুই ছিল না। দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর সে ঘরের এক কোনে একজন মানুষ দেখতে পেল, যে মানুষটি অত্যন্ত নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। চোর ভাবল এসেছি যেহেতু একটা কিছু না নিয়ে যাই কি করে। অবশ্যই একটা কিছু নিতে হবে, নতুবা আমার যাত্রাটাই অশুভ হবে। গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখতে পেল, ঘুমন্ত ব্যক্তির শিয়রে আটার একটি স্তুপ, তা দেখে চোরের মনে কিছুটা আশার সঞ্চার হল এবং সে নিজের চাদরটি বিছিয়ে নিল আটা নেয়ার জন্য। চোর এখনও আটা উঠানো শুরু করেনি; এরই মধ্যে ঘুমন্ত ব্যক্তি পার্শ্ব পরিবর্তন করতে যেয়ে একদম চোরের চাদরে এসে পড়ল। এবার চোর ভাবছে এলাম কিছু নিতে এখন দেখা যাচ্ছে উল্টো দিয়ে যেতে হবে। প্রচণ্ড শীতের রাত্রি তাই ঐ ব্যক্তি গভীর ঘুমে নাক ডাকছে। এবার চোর অপেক্ষায় রইল কখন ঘুমন্ত ব্যক্তি পার্শ্ব পরিবর্তন করবে আর সে নিজের চাদর উদ্ধার করবে। কিন্তু ঘুমন্ত ব্যক্তির পার্শ্ব পরিবর্তন করার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। চোর বেচারা বসে বসে নিরাশ হয়ে গেল। সে বসে ভাবছে আটা নিতে পারলাম আর না পারলাম, অন্তত: চাদরটাতো উদ্ধার করা দরকার।

ইতিমধ্যে পাশের মসজিদ থেকে ফজরের আযান ধ্বনি ভেসে এলো। এবার চোর উঠে পড়ল। কারণ ঘুমন্ত ব্যক্তি উঠে গেলে চাদরতো যাবেই সাথে আরো কিছু যেতে পারে। চাদর রেখেই সে দরজা দিয়ে বেড়িয়ে যেতে লাগল। ইতিমধ্যে হঠাৎ পিছন থেকে আওয়াজ এলো, ভাই! দরজাটা ভেজিয়ে যেয়ো।

চাদর হারানোর গোস্বায় চোরের শরীর এমনিতেই জ্বলছিল তাই সে বলল, না ভাই দরজাটা খোলাই থাক, কেউ এসে তোমার গায়ে উপরের চাদরটাও দিয়ে যাবে।

সুতরাং বলছিলাম কোন মানুষই বিপদাপদ এবং মসীবত থেকে মুক্ত নয়। যে যত বড় তার বিপদাপদও তত বড় এবং বেশী আর যে যত ছোট তার শান্তি এবং স্বস্তিও তত বেশী। মোটকথা যে কোন বিপদাপদ শংকায় 'আ'উযুবিল্লাহ' পড়ে নেয়া উচিত। যে কোন উদ্দেশ্য সাধনে অকৃতকার্য হওয়ার আশংকা হলে কিংবা কোন শত্রু বা হিংসুকের শত্রুতা বা হিংসার শিকার হওয়া বা জান মালের ক্ষতির আশংকা হলে, প্রবৃত্তি বা শয়তানের ধোকায় পড়ে বাহ্যিক বা আত্মিক কোন গোনাহে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার ভয় হলে, কিংবা কোন অশ্লীল চিন্তা-ভাবনা, খেয়াল মনে জাগ্রত হলে তৎক্ষণাত পড়ে নিবে 'আ'উযুবিল্লাহ' অথবা এই দোয়া পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনি ব্যতীত কোন আশ্রয় স্থল বা মুক্তির পথ নেই। সকল পেরেশানীই আপনার প্রদত্ত। তাথেকে রক্ষা করাও আপনার ক্ষমতার আওতাভুক্ত।

তীরান্দাযের আঁচল আকড়ে ধর

এক বুযুর্গ বয়ান করতে যেয়ে উপস্থিত লোকদেরকে জিজ্ঞেস করল, বলত একজন শক্তিশালী নিশানাবায, যার কোন নিশানা ব্যর্থ হয় না। আকাশ তার ধনুক আর জগতের সকল বালা-মসীবত এবং দুঃখ-কষ্ট তার তীর হলে এমন নিশানাবায থেকে বাঁচার উপায় কি?

লোকেরা উত্তর দিল, এমন নিশানাবায থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই। বুযুর্গ বললেন, 'পথ শুধু একটাই আছে আর তা হলো সেই তীরান্দাযের আঁচল আকড়ে ধরা।'

সুতরাং ভায়েরা! আল্লাহ পাকের আশ্রয় প্রার্থনা করো এবং তাঁর সান্নিধ্য অর্জন করো। যখনই অন্তরে কোন ধোকা সৃষ্টি হবে, সাথে সাথে বলো, 'হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং আপনার সু-দৃষ্টি কামনা

করছি।' তিনি এমনই দয়াশীল ও দাতা যে, খাঁটি মনে কেউ চাইলে তিনি তাকে কখনও ফিরিয়ে দেন না।

ধরুন! এক অন্ধকার রজনীতে মোষলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে। এই বৃষ্টির মধ্য দিয়ে একটি ছোট বাচ্চাকে ডাকত দল তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে আর সে দৌড়ে পালাচ্ছে আর চিৎকার করে বলছে, কে আছ আমাকে বাঁচাও! কে আছ আমাকে রক্ষা করো।

এমন একটি অসহায় এবং বিপদগ্রস্ত বাচ্চাকে আপনি কি আশ্রয় দিবেন না বা তাকে রক্ষা করবেন না? একথা নিশ্চিত যে, যদি আপনি এটা ঝোঁপড়ীতেও বসবাস করেন, তাহলেও তাকে আশ্রয় দিবেন। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ সকল প্রতিপালকের প্রতিপালক, আরহামুর রাহিমীন, কোন বান্দা বিপদের আশংকাগ্রস্ত হয়ে তাঁর নিকট আশ্রয় চাইলে তিনি তাকে অবশ্যই রক্ষা করবেন এবং তার জন্য আশ্রয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দিবেন।

এস্তে'আযাহ এমন একটি আমল, যার দ্বারা বান্দা আল্লাহ পাকের বড়ত্ব, প্রভুত্ব এবং দয়াশীলতা প্রত্যক্ষ করে থাকে এবং তার অন্তরে আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি ও স্বস্তি প্রদান করা হয়। আল্লাহর প্রতি ভরসা এবং আস্থার দৌলত অর্জিত হয়। এমন লোকদের মনে কাউকে কষ্ট দেয়ার মানসিকতা কখনও সৃষ্টি হয় না। সুতরাং এই আমলটিকে অভ্যাসে পরিণত করা প্রতিটা মানুষের একান্ত করনীয়।

চারটি আমলই আমাদের অভ্যাসে পরিণত হোক

সারকথা এই যে, মোট চারটি আমলের আলোচনা হলো, শোকর, সবর, এস্তেগফার, এস্তে'আযাহ। এই চারটি আমলকেই অভ্যাসে পরিণত করে নিলে ইনশাআল্লাহ ধীরে ধীরে পূরা জীবন দ্বীনের উপর এসে যাবে। দ্বীন-দুনিয়া উভয়ই সংরক্ষিত হবে এবং গোনাহের প্রতি ঘৃণা ও নেক কাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হবে, আল্লাহ তা'আলার সাথে নৈকট্য বৃদ্ধি পাবে এবং তাঁর সাথে এক বিশেষ সম্পর্ক সৃষ্টি হবে।

তিন কাল সংরক্ষিত হবে

মানুষের জীবনে মোট তিনটি কাল আসে। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত। এস্তেগফারের দ্বারা অতীত সংরক্ষিত হবে। শোকর এবং সবর দ্বারা বর্তমান

সংরক্ষিত হবে আর এস্তে'আযাহ দ্বারা ভবিষ্যত সংরক্ষিত হবে। যখন তিনটি কালই সংরক্ষিত হয়ে যাবে, তখন পূরা জীবন সংরক্ষিত হয়ে গেল। এই চারটি আমলকে যে ব্যক্তি অভ্যাসে পরিণত করবে, ইনশাআল্লাহ সে সদা-সর্বদা আল্লাহর সাহায্য এবং অনুগ্রহ অনুভব করতে থাকবে।

এই তোহ্‌ফাটুকু অন্যদের নিকট পৌঁছে দিন

আপনাদের নিকট আমার একটি আবেদন এই যে, আমার মুরশিদের দেয়া অত্যন্ত সহজ, দ্রুত ক্রিয়াশীল এই অমূল্য তোহ্‌ফাটুকু আমি আপনাদের নিকট পৌঁছে দিলাম। আপনারাও আপনাদের পরিবার-পরিজন এবং বন্ধু-বান্ধবের নিকট তা পৌঁছে দিবন। ইনশাআল্লাহ এর পাবন্দী করার দ্বারা অসংখ্য অগণিত গোনাহ এবং বিপদাপদ থেকে বেঁচে যেতে সক্ষম হবেন। আরো একটি কাজ আপনারা করবেন, আমার মুরশিদ আরেফবিল্লাহ ডাঃ আবদুল হাই আরেফী সাহেবের নামে সওয়াব রেসানী করে দিবেন, যিনি আমাকে এই মূল্যবান তোহ্‌ফাটুকু উপহার দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এই চারটি আমলের যথাযথ পাবন্দী করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُدَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

রোগ-দুশ্চিন্তাও আল্লাহর নেয়ামত

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

قال النبی صلی الله علیه وسلم اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل

বিপদগ্রস্ত অবস্থার জন্য সুসংবাদ

আমি যে হাদীসখানা আপনাদের সম্মুখে পাঠ করলাম, সে হাদীসটিতে ঐ ব্যক্তির জন্য সুসংবাদবাণী রয়েছে, যে বিভিন্ন রকম দুশ্চিন্তা এবং নানাবিধ রোগ-শোকে জর্জরিত এবং এসব সত্ত্বেও আল্লাহর সাথে তাঁর সম্পর্ক বহাল আছে এবং সে দোয়ার মাধ্যমে তার দুশ্চিন্তা ও বিপদ-আপদ থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা-কোশেশ করছে। এরূপ ব্যক্তির জন্য উল্লেখিত হাদীসে সু-সংবাদ এবং আশার বাণী এই রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মহাব্বত এবং অনুগ্রহেই এই দুঃখ-কষ্ট প্রদান করেছেন। এই দুঃখ-কষ্ট বা দুশ্চিন্তা তাঁর অসন্তুষ্টির ফল নয়।

বিপদাপদ দুশ্চিন্তা দুই প্রকার

যখন মানুষ কোন কারণে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয় কিংবা কোন রোগ-বিমারে লিপ্ত হয় বা দরিদ্রতা ও অস্বচ্ছলতায় ভোগে কিংবা ঋণগ্রস্ততার ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে অথবা বেকারত্বের পেরেশানীতে পতিত হয় অথবা পারিবারিক কোন দুশ্চিন্তা তাকে আহত করে ইত্যকার যত প্রকার পেরেশানীর সম্মুখীন মানুষ জীবনে হয়, তা দুই প্রকার। প্রথম প্রকার দুশ্চিন্তা বা বিপদ-আপদ হলো, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব-শাস্তি হিসেবে পতিত হয়। গোনাহের মূল শাস্তিতো মানুষ পরকালে পাবেই, কিন্তু কখনও কখনও আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দুনিয়াতেই সে আযাবের স্বাদ আস্বাদন করিয়ে থাকেন। যথা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ○

অর্থ ঃ আমি গুরু শাস্তির পূর্বে অবশ্যই তাদেরকে লঘূ শাস্তি আস্বাদন করাব, যাতে তারা (সৎ পথে) ফিরে আসে। (সূরা সেজদাহ ঃ আয়াত ২১)

আর দ্বিতীয় প্রকার দুঃখ-কষ্ট ও দুশ্চিন্তা হলো এই, যার দ্বারা বান্দার মর্তবা উঁচু করা উদ্দেশ্য হয়। সুতরাং বান্দার মর্তবা উঁচু করনার্থে এবং তাকে প্রতিদান ও সওয়াব প্রদান করতে এ সকল দুঃখ-কষ্ট মসীবতে তাকে পতিত করা হয়।

বিপদাপদ্ দুঃখ-কষ্ট আল্লাহর আযাব

এখন কথা হচ্ছে এই উভয় প্রকার বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টের মাঝে আমরা কিভাবে পার্থক্য করব। কোনটা প্রথম প্রকার আর কোনটা দ্বিতীয় প্রকার তা কিভাবে নির্ণয় করব?

এই উভয় প্রকার বিপদাপদ ও দুশ্চিন্তার আলামত ভিন্ন ভিন্ন। বিপদাপদ ও দুশ্চিন্তায় লিপ্ত হয়ে যদি মানুষ আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ না করে, বরং বিপদগ্রস্ত হওয়ার কারণে আল্লাহর তকদীরের উপর প্রশ্ন-অভিযোগ উত্থাপন করতে শুরু করে। যথা এরূপ বলে, (নাউযুবিল্লাহ) এই দুঃখ-কষ্ট মসীবতের জন্য পৃথিবীতে আমিই অবশিষ্ট ছিলাম, নতুবা আমার উপর কেন বিপদ পতিত হচ্ছে? এই কষ্ট আমাকে কেন দেয়া হচ্ছে?---ইত্যাদি।

এমনিভাবে বিপদগ্রস্ত হওয়ার ফলে আল্লাহ প্রদত্ত হুকুম-নির্দেশ ছেড়ে দেয়। যথা-আগে নামায পড়ত বিপদগ্রস্ত হওয়ার কারণে নামায ছেড়ে দিল। আগে যিকির-আযকারের মা'মূল পাবন্দীর সাথে আদায় করত, এখন সে মা'মূল ছেড়ে দিল। পতিত মসীবত দূর করার জন্য বাহ্যিক উপায়-উপকরণ গ্রহণ করছে ঠিকই কিন্তু আল্লাহ পাকের নিকট তাওবা-এস্তেগফার করছে না, দোয়া-প্রার্থনা করছে না। এ সবই এর আলামাত যে, যে কষ্ট-মসীবত তার উপর এসেছে, তা আল্লাহর আযাব এবং শাস্তি। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক ঈমানদারকে এর থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

কষ্ট-মসীবত আল্লাহর রহমতও

আর যদি কষ্ট-মসীবতে পতিত হওয়ার পরও আল্লাহ পাকের দিকে মনোনিবেশ করে, আল্লাহর নিকট দু' হাত তুলে প্রার্থানা জানায়- প্রভু হে! আমি যে কমজোর-দুর্বল! এই দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার সাধ্য আমার নেই। হে আল্লাহ! আপনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাকে এ পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দিন। আর দিলমনে দুঃখ-মসীবতের উপর কোন প্রশ্ন-অভিযোগ উত্থাপন করে না। পতিত দুঃখ-মসীবতের কারণে কষ্টতো অবশ্যই অনুভব করছে এবং দু'চোখ জুড়ে অশ্রুর ধারাও প্রবাহিত হচ্ছে, কষ্ট-বেদনাও প্রকাশ করছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ পাকের নির্ধারিত তকদীরের উপর অভিযোগ তুলছে না। বরং পূর্বের তুলনায় আরো অধিক আল্লাহমুখী হয়েছে। পূর্বের চেয়ে অধিক নামাযী হয়েছে, অধিকহারে আল্লাহকে ডাকছে। এ সবই এর আলামত যে, এই দুঃখ-মসীবত তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে মর্তবা উঁচু হওয়ার এবং পুণ্যবৃদ্ধির মাধ্যম। তাছাড়া এসব কষ্ট-মসীবত তার জন্য রহমত এবং তার সাথে আল্লাহর মহাব্বতের প্রমান ও দলীল।

এ জগতে কেউ বিপদাপদ ও দুশ্চিন্তা মুক্ত নয়

এখন প্রশ্ন হয় কারো প্রতি কারো মহাব্বত-ভালবাসা হলে ভালবাসার দাবীতো হলো একে অপরকে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদানের ব্যবস্থা করা। বান্দার সাথে যদি আল্লাহর ভালবাসার সম্পর্ক হয়, তাহলেতো বান্দাকে সর্বদা শান্তিতে রাখা উচিত। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে কষ্ট-মসীবতে পতিত করেন কেন?

এর জবাব হলো, এ জগতে এমন কোন মানুষ নেই যে কখনও কোন দুঃখ-কষ্ট বা মসীবতে পতিত হয়নি, কোন বিষাদ-বেদনায় জর্জরিত হয়নি; চাই তিনি যত বড় নবী-পয়গাম্বর, ওলী-দরবেশ কিংবা রাজা-বাদশাহই হোন না কেন। কোন মানুষের পক্ষেই এটা সম্ভব নয় যে, সে দুঃখ-কষ্ট ব্যতীত জীবন গোজরান করবে। কেননা আল্লাহপাক এ জগতটাকে তৈরীই করেছেন এভাবে যে, এখানে আনন্দ-বিষাদ, সুখ-দুখ পাশাপাশি অবস্থান করবে। শুধুই শান্তির স্থান এটা নয়, বরং শুধুই শান্তির স্থান হলো বেহেশত। যার ব্যাপারে বলা হয়েছে لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ অর্থাৎ সেখানে থাকবে না কোন ভয়-ভীতি এবং থাকবে না কোন দুশ্চিন্তা। সুতরাং আসল শান্তি ও আরামের স্থানতো হলো বেহেশত। আর এই দুনিয়ার জগতটাই এমন যে, এখানে কখনও সুখ আসবে কখনও দুঃখ আসবে, কখনও শীতে শরীরে কাঁপন ধরবে, কখনও গরমে ঘর্মাক্তবদন হবে, কখনও রৌদ্রের তাপ, কখনও

মেঘমালার ছায়া, কখনও এক রকম, কখনও অন্য রকম, সুতরাং কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয় দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে জীবন যাপন করা।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রাহঃ) স্বীয় মাওয়ায়েজে একটি ঘটনা লিখেছেন যে, হযরত খিযির (আঃ)-এর সাথে এক ব্যক্তির সাক্ষাত ঘটে। সে ব্যক্তি হযরত খিযির (আঃ)কে বলল, হযরত আপনি আমার জন্য দোয়া করুন, যেন জীবনে কোন দুঃখ-কষ্ট-মসীবত আমাকে স্পর্শ না করে এবং সমগ্র জীবন আমি দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে অতিবাহিত করতে পারি। হযরত খিযির (আঃ) বললেন, এরূপ দোয়াতো আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়। কারণ এ দুনিয়াতে দুঃখ-কষ্ট এটা আবশ্যম্ভাবী বিষয়। তবে তুমি একটা কাজ করতে পার, তাহলো তুমি এমন একজন মানুষ খুঁজে বের কর, যে ব্যক্তি তোমার চেয়ে কম দুঃখ-কষ্ট-মসীবতের অধিকারী। তারপর তুমি আমাকে তার সন্ধান দাও, আমি তোমার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করব আল্লাহ যেন তোমাকে তার ন্যায় করে দেন।

সে ব্যক্তি যারপরনেই খুশী হয়ে চলে গেল এবং ভাবল এমন মানুষের তো নিশ্চয় অভাব হবে না যে অনেক বেশী আরাম-আয়েশে জীবন গোজরান করছে। সুতরাং সে সুখী মানুষের সন্ধানে বের হয়ে পড়ল। কখনও এক ব্যক্তির সুখ-শান্তি ও মাল-দৌলত দেখে তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয় যে, এই ব্যক্তির ন্যায় হওয়ার দোয়া করিয়ে নিব, কিন্তু পরক্ষণেই আবার আরেকজনকে তার চেয়ে অধিক ধন-সম্পদ ও সুখ-শান্তির অধিকারী বলে মনে হয়। মোটকথা এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অনুসন্ধানের পর এক জওহরীর প্রতি তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল, যে স্বর্ণ-রোপা, মণি-মুক্তা এবং মূল্যবান পাথরের ব্যবসা করত। অত্যন্ত সু-সজ্জিত এবং জাঁকজমকপূর্ণ তার দোকান। মন কেড়ে নেয়ার মত আলীশান তার বাড়ী। অত্যন্ত মূল্যবান তার সওয়ারী। তার চতুর্পার্শ্বে চাকর-নওকর খেদমতে নিয়োজিত। সুন্দর ও সু-দর্শন তার এক ছেলে। বাহ্যিক অবস্থা দেখে মনে হল তার ন্যায় সুখী মানুষ বোধয় আর কেউ নেই। সে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল এই জওহরীর ন্যায় হওয়ার দোয়াই করাবে।

হযরত খিযির (আঃ)-এর নিকট ফিরে যাওয়ার জন্য সে রওনা হবে এ মুহূর্তে হঠাৎ তার মনে হল, তার বাহ্যিক অবস্থা দেখেতো ঠিকই মনে হচ্ছে সে অত্যন্ত সুখী মানুষ, কিন্তু যদি ভিতরগতভাবে সে এমন কোন রোগ-বিমারে আক্রান্ত থাকে, যা আমার বর্তমান অবস্থার চেয়েও নিম্নতর। তাহলেতো আমার অবস্থা বর্তমানের চেয়েও খারাপ হয়ে যাবে। সুতরাং জওহরীকে গিয়ে জিজ্ঞেস করে দেখি তার অবস্থা কি। সুতরাং সে জওহরীর নিকট গেল এবং বলল, জনাব আপনাকে দেখেতো খুবই সুখী মানুষ বলে মনে হচ্ছে। কারণ অঢেল ধন-সম্পদের অধিকারী আপনি। চাকর-নওকরের অভাব নেই। সুতরাং আমি আপনার ন্যায় হতে চাই। কিন্তু আমি জানতে এসেছি আভ্যন্তরীণ কোন রোগ-বিমার বা কোন দুশ্চিন্তা-পেরেশানী আপনার নেই তো?

জওহরী তাকে নির্জনে নিয়ে গিয়ে গেল এবং বলল, বাহ্যিক অবস্থা দেখে তুমি মনে করেছ আমি খুব সুখী মানুষ, কারণ আমার অঢেল ধন-সম্পদ রয়েছে, চাকর-নওকর রয়েছে, যারা আমার খেদমতে সদা ব্যস্ত; কিন্তু বাস্তব কথা হল আমার ন্যায় দুঃখী, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, কষ্ট-মসীবতে পতিত মানুষ পৃথিবীতে মনে হয় আর দ্বিতীয় জন নেই। অত:পর সে তার স্ত্রীর চরিত্রহীনতার মর্মন্তুদ কাহিনী বর্ণনা করতে যেয়ে বলল, যে সুন্দর ও সু-দর্শন ছেলেটি দেখছ, সেটা আমার সন্তান নয়। যার কারণে আমার কোন একটি মুহূর্ত কষ্ট ও দুশ্চিন্তামুক্ত অতিবাহিত হয় না এবং আমার মনে দুঃখ-বেদনা ও অশান্তির যে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে তা তোমাকে বোঝানো কোনভাবেই সম্ভব নয়। সুতরাং তুমি আমার ন্যায় হওয়ার আকাঙ্খা কখনও করো না।

এবার সে বুঝতে সক্ষম হল যে, পৃথিবীতে ধন-সম্পদ ও বাহ্যিক আরাম-আয়েশে যত মানুষকেই দেখতে পাচ্ছি, তারা সকলেই কোন না কোন দুশ্চিন্তা ও দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত।

দ্বিতীয়বার হযরত খিযির (আঃ)-এর সাথে তার সাক্ষাত হলে খিযির (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কি মিয়া বলো কার মত হতে তুমি আগ্রহী? সে জবাব দিল দুঃখ-কষ্ট ও দুশ্চিন্তা মুক্ত এমন কোন মানুষই আমি পেলাম না, যার ন্যায় হওয়ার জন্য আমি দোয়া করাব।

হযরত খিযির (আঃ) বললেন, আমি তো তোমাকে পূর্বেই বলে দিয়েছি, এ জগতে দুঃখ-মসীবত ও দুশ্চিন্তামুক্ত কোন মানুষ তুমি পাবে না। তবে আমি তোমার জন্য এই দোয়া করে দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ তোমাকে শান্তিময় জীবন দান করুন।

প্রত্যেক ব্যক্তির প্রদত্ত নেয়ামত ভিন্ন ভিন্ন

এ জগতে কোন মানুষই বিষাদ-বেদনা, দুঃখ-কষ্ট মুক্ত হতে পারবে না। তবে কারো জীবনে দুঃখ-কষ্ট কম আসে কারো বেশী আসে। কারো এক ধরনের বিপদ কারো অন্য ধরনের বিপদ। আল্লাহ্ তা'আলা এ পৃথিবীর নেযাম বা নিয়ম-নীতিই এরূপ বানিয়েছেন যে, তিনি কাউকে ধন-সম্পদ দানে বাধিত করেন আবার কারো থেকে ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নেন। কাউকে সুস্থতা দান করেন এবং ধন-সম্পদ থেকে বঞ্চিত করেন, আবার কাউকে ধন-সম্পদ দান করলেও তাকে সুস্থতা থেকে বঞ্চিত করেন। কারো পারিবারিক অবস্থান ভাল হলেও তার সামাজিক অবস্থান খারাপ, আবার কারো সামাজিক অবস্থান ভাল হলেও পারিবারিক অবস্থান খারাপ।

মোটকথা এ জগতের প্রতিটা মানুষের অবস্থা ভিন্ন। প্রত্যেকটা মানুষ কোন না কোন কষ্ট-মসীবত ও চিন্তা-পেরেশানীতে পতিত। কিন্তু যদি প্রথম প্রকারের মসীবত ও পেরেশানী হয়, তাহলে মানুষের জন্য তা আযাব আর যদি দ্বিতীয় প্রকারের মসীবত ও পেরেশানী হয়, তাহলে তা রহমত এবং পুণ্যবৃদ্ধির ওসীলা।

আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের দুঃখ-কষ্ট কেন আসে?

এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

اذا احب الله عبدا صب عليه البلاء صبا

অর্থাৎ আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে মহাব্বত করেন ভালবাসেন, তখন তার উপর নানারকম পরীক্ষা এবং কষ্ট-মসীবত পতিত করেন। কোন বর্ণনায় এসেছে, ফেরেশ্তাগণ তখন আল্লাহকে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ! সে তো আপনার প্রিয় বান্দা, পুণ্যবান বান্দা, আপনার প্রতি তার পূর্ণ ভালবাসা রয়েছে, তা সত্ত্বেও আপনি তার উপর এত অধিক পরীক্ষা এবং

কষ্ট-মসীবত প্রেরণ কেন করছেন? জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমার এই বান্দাকে এই অবস্থায় থাকতে দাও। কারণ তার দোয়া-প্রার্থনা, তার আহাজারী, তার কাকুতি-মিনতি আমার নিকট খুব ভাল লাগে।

হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে যদিও খুব দুর্বল, কিন্তু তার সমার্থবোধক অনেক হাদীস এসেছে। যথা অন্য এক হাদীসে এসেছে, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশ্তাদেরকে বলেন, আমার অমুক বান্দার নিকট যাও এবং তাকে পরীক্ষায় লিপ্ত কর। কেননা তার আহাজারী এবং কাকুতি-মিনতি আমার নিকট খুবই ভাল লাগে। মোটকথা এই জগতে দুঃখ-কষ্ট ও মসীবত আসবেই। তাই আল্লাহ্ তা'আলা চান, সে যেহেতু আমার প্রিয় বান্দা, আমি তার ক্ষণিকের কষ্টকে চিরস্থায়ী শান্তির ওসীলা বানাব যেন তার মর্তবা উঁচু থেকে উঁচুতরে পৌঁছে যায়। পরকালে যখন সে আমার নিকট উপস্থিত হবে, তখন যেন সে গোনাহ থেকে সম্পূর্ণ পাক-পবিত্র হয়ে উপস্থিত হয়। এ জন্যই আমি প্রিয় এবং মাহবূব বান্দাদেরকে দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদে পতিত করি।

ধৈর্যশীলদের পুরস্কার

এ জগতে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম অপেক্ষা আল্লাহর অধিক প্রিয় বান্দা আর কেউ নন, অথচ তাদের ব্যাপারে হাদীসে শরীফে এসেছে ঃ

اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل

অর্থাৎ পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে বেশী পরীক্ষার সম্মুখীন হন হযরত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম। এর পর যারা যত বেশী নবীগণের নিকটবর্তী হন যত বেশী নবীগণের সাথে সম্পর্ক রাখেন, তারা তত বেশী পরীক্ষার সম্মুখিন হন।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)কে দেখুন, যার উপাধি ছিল 'খলীলুল্লাহ' আল্লাহর দোস্ত। অথচ তাঁর উপর অনেক বড় বড় বিপদ এবং মসীবত পতিত হয়েছে। যথা তাঁকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়েছে, নিজের প্রিয় সন্তানকে যবাহ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, বিবি-বাচ্চাকে এক পানি-খাদ্যবিহীন উপত্যকায় ছেড়ে যাওয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে। মোটকথা অনেক বড় বড় পরীক্ষার সম্মুখিন তিনি হয়েছেন। এত কষ্ট-মসীবত

তাঁকে কেন প্রদান করা হল? এ জন্য যে, তাঁর মর্তবা উঁচ্চ থেকে উচ্চতর করা হবে। সুতরাং কেয়ামত দিবসে কষ্ট-মসীবতের প্রতিদানে যখন আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পুরস্কার প্রদান করবেন, তখন মনে হবে এই প্রতিদানের সম্মুখে সে সকল দুঃখ-কষ্ট অতি নগণ্য এবং তুচ্ছ ফলে তারা সকল দুঃখ-কষ্ট একেবারে ভুলে যাবে।

অন্য এক হাদীসে এসেছে, কেয়ামত দিবসে দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণকারীকে যখন আল্লাহ তা'আলা পুরস্কার দিবেন, তখন অন্যরা সে পুরস্কার দেখে আফসোস করবে, হায়! যদি দুনিয়াতে আমাদের শরীরের চামড়া কাঁচি দিয়ে কাটা হত এবং আমরা ধৈর্যধারণ করতাম, তাহলে আজকে আমরাও পুরস্কারের অধিকারী হতাম!

কষ্ট-মসীবতের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রাহঃ) বলেন, মানুষের জীবনে কষ্ট-মসীবতের দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন কারো শরীরে মরাত্মক কোন রোগ হল। ফলে ডাঃ তাকে অপারেশন করার সিদ্ধান্ত নিল। এখন রোগীর খুব ভাল করেই জানা রয়েছে যে, অপারেশন করলে কাটা-ছেড়া করতে হবে, ফলে কষ্ট হবে; কিন্তু তা সত্ত্বেও সে অপারেশন তাড়াতাড়ি করার জন্য ডাক্তারের নিকট আবেদন জানায় এমন কি অন্যকে দিয়ে সুপারিশ পর্যন্ত করায় এবং এই অপারেশনের জন্য ডাক্তারকে মোটা অংকের ফিও দেয়। কেমন যেন নিজের উপর অস্ত্রপাচারের জন্য ডাক্তারকে ফি দিচ্ছে। এসব কেন করছে? এ জন্য যে, সে ভাল করেই জানে এই অপারেশন ও অস্ত্রপাচারের কষ্ট সাধারণ এবং সাময়িক। কয়দিন পরেই যখম শুকিয়ে তা ভাল হয়ে যাবে এবং অপারেশনের পর যে স্থায়ী সুস্থতা অর্জিত হবে, তা এতই মূল্যবান যে তার তুলনায় এই সাময়িক কষ্ট অতি নগণ্য এবং তুচ্ছ। আর ডাঃ সাহেব অস্ত্রপাচার করে যে কাটা-ছেড়া করছেন বাহ্যত: যদিও দেখা যাচ্ছে তিনি রোগীকে কষ্ট দিচ্ছেন, কিন্তু এই রোগীর জন্য এ মুহূর্তে ডাক্তারের চেয়ে দরদী ও প্রিয় ব্যক্তি আর কেউ নন। কেননা তিনি অপারেশন করে তার সুস্থতার ব্যবস্থা করছেন।

ঠিক এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে কষ্ট-মসীবতে পতিত করেন, তখন মূলত: তার অপারেশন চলে, যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাকে পাক-পবিত্র করেন। ফলে যখন সে আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে, তখন গোনাহ থেকে সম্পূর্ণ পাক-পবিত্র অবস্থায় উপস্থিত হবে।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত

অথবা কষ্ট-মসীবতের দৃষ্টান্ত এরূপ যে, আপনার একজন খুবই ঘনিষ্ট এবং প্রিয় বন্ধু রয়েছে। দীর্ঘদিন যাবত তার সাথে আপনার সাক্ষাত হয় না অথচ আপনি তার সাক্ষাতের জন্য একান্তভাবে আকাঙ্খিত। হঠাৎ একদিন আপনার সেই বন্ধু এসে উপস্থিত হল এবং পেছন থেকে আপনাকে ঝাপটে ধরে খুব জোরে চাপ দিতে লাগল এবং এমন জোরে চাপ দিতে লাগল যে আপনি কোমরে খুব ব্যাথা পাচ্ছেন। এবার আপনার বন্ধু আপনাকে চমকে দিয়ে বলল, আমি তোমার অমুক বন্ধু, আমার ধরার কারণে যদি তুমি ব্যাথা পাও, তাহলে ঠিক আছে আমি তোমাকে ছেড়ে অন্য কাউকে এভাবে ধরব, যাতে তোমার ব্যাথা দূর হয়ে যায়।

যদি আপনি মহাব্বতের সঠিক দাবীদার হন, তাহলে তখন বন্ধুকে এটাই বলবেন যে, আরে বন্ধু এটুকু আর কি ব্যাথা, আরো জোরে চাপ দাও এবং আরো কষ্ট দাও, কারণ আমি তো দীর্ঘকাল তোমারই অপেক্ষায় আছি এবং তোমার সাক্ষাত কামনা করছি। অত:পর সে হয়ত ভাবাবেগে এই কবিতা আবৃতি করবে ঃ

نہ شود نصیب دشمن کہ شود ھلاک تیغت

سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی

অর্থাৎ তোমার তীরাঘাতে ধ্বংস হওয়ার
সৌভাগ্য যেন দুশমনের না হয়।
তোমার বন্ধুর মাথা এখনও অক্ষত,
সুতরাং তুমি তোমার খঞ্জরের পরীক্ষা চালাও।

কষ্ট-মসীবতে ‘ইন্নালিল্লাহ’ পাঠকারী

এমনিভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে কষ্ট-মসীবত আসে মূলত: তা বান্দার মর্তবা উঁচু করার জন্যই আসে, যারা আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ○ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ○ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ○

অর্থ ঃ এবং অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও ধৈর্যধারণকারীদেরকে, যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাব। তারা সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হেদায়েতপ্রাপ্ত। (সূরা বাকারা আয়াত ১৫৫-১৫৭)

মোটকথা এটা আল্লাহ তা'আলার নেযাম বা বিধান যে তিনি স্বীয় নেক বান্দাদের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কখনও কখনও তাদেরকে কষ্ট-মসীবত দিয়ে থাকেন।

আমি বন্ধুদেরকে কষ্ট দিয়ে থাকি

আমার শ্রদ্ধে পিতা হযরত মুফতী শফী (রাহঃ) কখনও কখনও অত্যন্ত আবেগাপ্লুত হয়ে কবিতার এই পংক্তি দু'টি আবৃতি করতেন ঃ

ما پروریم دشمن وما می کشیم دوست

کس را چون وچرا نرسد در قضاء ما

অর্থাৎ কখনও আমি আমার দুশমনকে লালন-পালন করি এবং দুনিয়ার বুকে তাকে উন্নতি দান করি, পক্ষান্তরে আমার দোস্তকে কষ্ট-তকলীফ দেই, তাকে শাসন করি।

আমার বিধিবদ্ধ ফায়সালা ও তকদীরে চু-চেরা করার অধিকার কারো নেই। কেননা আমার হেকমত ও রহস্য বুঝার ক্ষমতা কার রয়েছে?

এক আশ্চর্যজনক ঘটনা

হযরত হাকীমুল উম্মত (রাহঃ) স্বীয় মাওয়ায়েজে একটি ঘটনা লিখেন যে, এক শহরে দুই ব্যক্তি মৃত্যু শয্যায় শায়িত। জীবনের সর্বশেষ মুহূর্তে তারা উপনীত। একজন মুসলমান অপরজন ইয়াহুদী। মরণমুহূর্তে ইয়াহুদীর মনে মৎস খাওয়ার বাসনা জাগল কিন্তু আশ-পাশে কোথাও মৎসের ব্যবস্থা ছিল না। অপর দিকে মুসলমান ব্যক্তির অন্তরে যাইতুনের তৈল খাওয়ার ইচ্ছা জাগল। ইতিমধ্যে আল্লাহ তা'আলা দুইজন ফেরেশ্তাকে ডাকলেন। একজনকে বললেন, অমুক শহরে একজন ইয়াহুদী অন্তিম শয্যায় শায়িত, তার মৎস খাওয়ার ইচ্ছা হয়েছে। তুমি এক কাজ করো একটি মৎস নিয়ে তার বাড়ীর পুকুরে ফেলে দিয়ে আস, যাতে সে তার সর্বশেষ আকাঙ্খা পূরণ করে নিতে পারে।

দ্বিতীয় ফেরেশ্তাকে বললেন, অমুক শহরে একজন মুসলমান জীবন সায়াহ্নে উপস্থিত, তার মনে যাইতুনের তৈল খাওয়ার বাসনা জেগেছে আর যাইতুনের তৈল তার আলমিরাতে রাখা আছে, তুমি গিয়ে সেই তৈল নষ্ট করে দিয়ে আস, যাতে সে তার এই আকাঙ্খা পূর্ণ করতে না পারে। সুতরাং উভয় ফেরেশ্তা তাদের মিশনে রওয়ার হয়ে গেল। পথিমধ্যে তাদের উভয়ের সাক্ষাত হলে একজন অপরজনকে জিজ্ঞেস করল তুমি কি কাজে যাচ্ছ? একজন বলল, অমুক ইয়াহুদীর মৎস খাওয়ার বাসনা পূরণ করার জন্য যাচ্ছি। অপর ফেরেশ্তা বলল, আমি অমুক মুসলমানের যাইতুনের তৈল নষ্ট করার জন্য যাচ্ছি। উভয় উভয়ের মিশনের কথা জানতে পেরে তারা খুবই বিস্মিত হলো এই ভেবে যে, উভয়কে পরস্পর বিরোধী দু'টি কাজের জন্য কেন প্রেরণ করা হল? কিন্তু যেহেতু আল্লাহ পাকের হুকুম ছিল, তাই তারা যার যার দায়িত্ব যথাযথ পালন করতে চলে গেল।

দায়িত্ব পালনের পর ফিরে এসে তারা উভয়ে আল্লাহর নিকট আরয করল, প্রভু হে! আমরা আপনার নির্দেশ পালন করে এসেছি, তবে একটি বিষয় আমাদের বোধগম্য হল না তা এই যে, একজন মুসলমান, যে

আপনার আনুগত্যশীল ছিল এবং তার পাশে তৈল উপস্থিতও ছিল তা সত্ত্বেও আপনি সে তৈল নষ্ট করিয়ে দিলেন। অপরদিকে এক ইয়াহুদী, তার আশপাশে মৎস উপস্থিত ছিল না, তা সত্ত্বেও আপনি তাকে মৎস খাওয়ানোর ব্যবস্থা করলেন। আমাদের বুঝে আসছে না আসল ঘটনা কি?

আল্লাহ তা'আলা জবাব দিলেন, আমার কর্মকান্ডের হেকমত বা রহস্য সম্পর্কে তোমাদের কোন জ্ঞান না থাকাই স্বাভাবিক। আসল ঘটনা হলো, আমার বিধি-বিধান কাফেরদের বেলায় এক রকম এবং মুসলমানদের বেলায় অন্য রকম। কাফেরদের বেলায় আমার বিধান হলো তারাও যেহেতু দুনিয়ার জগতে নেক কাজ করে থাকে। যথা দান-খয়রাত করে, কখনও কোন অভাবী ও বিপদগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করে, তাদের এ সকল পুণ্যের কাজ যেহেতু পরকালের জন্য কবুল করা হয় না, তাই তাদের পুণ্যসমূহের প্রতিদান আমি দুনিয়াতেই চুকিয়ে দেই, যাতে পরকালে নেক কাজের কোন প্রতিদান তাদের অবশিষ্ট না থাকে। আর মুসলমানদের ব্যাপারে আমার বিধান হল, আমি চাই মুসলমানদের গোনাহের হিসাব দুনিয়াতেই চুকিয়ে দিতে, যাতে আমার নিকট তারা গোনাহ থেকে সম্পূর্ণ পাক-পবিত্র হয়ে আসে।

সুতরাং ইয়াহুদী ব্যক্তি যত নেক কাজ করেছিল, তার প্রতিটা নেক কাজের প্রতিদান আমি দুনিয়ার বুকেই দিয়ে দিয়েছি শুধু একটি মাত্র নেক কাজের প্রতিদান তার বাকী ছিল। এখন তার মৃত্যু হচ্ছে, সে আমার নিকট আসছে। যখন তার মৎস খাওয়ার আকাঙ্খা মনে জাগ্রত হল, তখন তার আকাঙ্খা পূরণার্থে সেই একটি নেকীর বদলা হিসেবে তাকে মৎস খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছি, যাতে যখন সে আমার নিকট আসবে, তখন তার সকল নেক কাজের হিসাব চুকানো থাকে।

অপরদিকে রোগাক্রান্ত অবস্থায় মুসলমান ব্যক্তির সকল গোনাহ ক্ষমা হয়ে গিয়েছিল, শুধু মাত্র একটি গোনাহ তার তখনও বাকী ছিল। এখন সে আমার নিকট আসছে। যদি এ অবস্থায়ই সে আমার নিকট আসত, তাহলে একটি গোনাহ তার আমলনামায় থেকে যেত, তাই আমি চাইলাম যাইতুনের তৈল নষ্ট করে দিয়ে এবং তার আকাঙ্খা অপূর্ণ রেখে মৃত্যুর মুহূর্তেও

তাকে একটি কষ্ট দেই, ফলে তার যে একটি গোনাহ অবশিষ্ট রয়েছে তা মাফ হয়ে যাবে এবং সে আমার নিকট গোনাহ থেকে সম্পূর্ণ পাক-পবিত্র হয়ে আসবে।

সুতরাং আল্লাহর হেকমতের অনুভব কার পক্ষে করা সম্ভব? আমাদের এই ক্ষুদ্র ব্রেইণ দিয়ে তাঁর হেকমত উপলব্ধি করা আদৌ কি সম্ভব? আল্লাহ তা'আলার হেকমতের দ্বারা এই সমগ্র জগত চলছে। তাঁর হেকমতসমূহ সমগ্র সৃষ্টিজগতে পরিব্যপ্ত রয়েছে। এ ক্ষুদ্র মানুষের পক্ষে কোন ভাবেই সম্ভব নয় তা অনুভূতিতে আনা। আমাদের কারো জানা নেই কখন কোন সময় আল্লাহর কোন হেকমত জারী হয়ে যায়।

এই কষ্ট-মসীবত বাধ্যতামূলক সাধনা

ডাঃ আবদুল হাই আরেফী (রাহঃ) বলেন, পূর্বের যুগের লোকেরা আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য কোন শায়খ বা বুযুর্গের নিকট গেলে, শায়খ বা বুযুর্গগণ তাদেরকে অনেক বেশী মোজাহাদা- সাধনা করাতেন এবং সে সকল কষ্ট-সাধনা ইচ্ছাধিন হত। আর এ যুগে এত বেশী কষ্ট-সাধনা করানো হয় না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বান্দাদেরকে কষ্ট-সাধনা থেকে বঞ্চিত করেননি, বরং কখনও কখনও আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এমনিতেই বান্দাদেরকে বাধ্যতামূলক এবং জোরপূর্বক কষ্ট-সাধনা করানো হয় এবং সে সকল বাধ্যতামূলক সাধনা দ্বারা মানুষের উন্নতি সাধিত হয় বরং ইচ্ছাধিন সাধনার তুলনায় তা আরো দ্রুতগামী হয়।

সুতরাং সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমগণের জীবনে ইচ্ছাধিন কষ্ট-সাধনা খুব একটা ছিল না। যথা তাদের সময় এরূপ ছিল না যে, সাধ্য থাকা সত্ত্বেও অনাহারে কাটাবে কিংবা জানা সত্ত্বেও নিজেকে কষ্ট দিতে হবে--ইত্যাদি; কিন্তু তাঁদের জীবনে বাধ্যতামূলক কষ্ট-সাধনা অনেক বেশী ছিল। সুতরাং কালোমায়ে তাইয়েবা পড়ার দায়ে তাঁদেরকে মরুভূমির উত্তপ্ত বালুরাশিতে শুইয়ে রাখা হত, বুকের উপর অনেক ভারী পাথর রেখে দেয়া হত এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথিত্ব বরণ করার দায়ে তাদের কত বীভৎস কষ্ট-যাতনা সহ্য করতে হয়েছে; এসবই ছিল বাধ্যতামূলক কষ্ট-সাধনা। এ জাতীয় কষ্ট-সাধনার ফলে সাহাবায়ে

কেরামের মর্তবা এত উচ্চতরে পৌছে গেছে যে, একজন অ-সাহাবী সে মর্তবার নাগাল কোনভাবেই পাবে না।

এ জন্যই বলা হয় বাধ্যতামূলক কষ্ট-সাধনার দৌলতে মর্তবা খুব দ্রুততার সাথে উন্নিত হয় এবং মানুষ খুব তাড়াতাড়ি উন্নতি সাধন করে। সুতরাং যে সকল কষ্ট-মসীবত ও দুশ্চিন্তায় মানুষ জর্জরিত হচ্ছে, এসবই বাধ্যতামূলক সাধনা করানো হচ্ছে। বস্তুত: তা আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতের ওসীলা।

কষ্ট-মসীবতের তৃতীয় দৃষ্টান্ত

যেমন ধরুন একটি ছোট বাচ্চা। তাকে গোসল করাতে এবং হাত পা ধৌত করাতে গেলে সে ভয়ে কাতর হয়ে পড়ে এবং সে কষ্ট অনুভব করে। কিন্তু মা তাকে জোরপূর্বক গোসল করায়, তার শরীর থেকে ময়লা দূর করে দেয়। গোসল করানোর সময় বাচ্চা কান্নাকাটি করে-চিল্লায়, তা সত্ত্বেও মা তাকে ছাড়ে না। এ মুহূর্তে বাচ্চা নিশ্চয় ভাবছে মা আমার উপর অবিচার এবং বাড়াবাড়ি করছে, আমাকে কষ্ট দিচ্ছে, অথচ মা তাকে স্নেহ-মমতার কারণেই গোসল দিচ্ছে এবং ময়লা-আবর্জনা তার শরীর থেকে দূর করছে, তার শরীর পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করছে। এ বাচ্চা যখন একদিন বড় হবে, তখন তার অবশ্যই বুঝে আসবে, গোসল করানো এবং ঘষা-মাজার যে কাজটি মা আমাকে করেছেন, সেটা ছিল তাঁর অত্যন্ত মহাব্বত ও স্নেহ-মমতার বহিঃপ্রকাশ, যাকে আমি জুলুম এবং অবিচার মনে করেছি। আমার মা যদি আমাকে ঘষে মেজে আমাকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন না করতেন, তাহলে আজকে আমার শরীর ময়লাযুক্ত থেকে যেত।

চতুর্থ দৃষ্টান্ত

অথবা মনে করুন এক বাচ্চাকে মাতা-পিতা স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে। প্রতিদিন প্রত্যুষে মা ছেলেকে জোরপূর্বক স্কুলে পাঠিয়ে দেয়। স্কুলে যাওয়ার মুহূর্তে সে ছেলে কান্নাকাটি করে, চিল্লাচিল্লি করে। চার পাঁচ ঘন্টা স্কুলে বসে থাকাকে সে বন্দী জীবনের ন্যায় মনে করে। কিন্তু বাচ্চার উজ্জল ভবিষ্যত চিন্তা করে স্নেহ-মমতা বা মহাব্বতের দাবী হল, তাকে জোর করে হলেও স্কুলে পাঠানো। এই বাচ্চা যখন বড় হবে, তখন তার বুঝে আসবে, মাতা-পিতা যদি আমাকে জোরপূর্বক স্কুলে না পাঠাতেন এবং না পড়াতেন,

তাহলে আজকে শিক্ষিত মানুষের কাতারে আমার নাম থাকত না, বরং মূর্খ-জাহেলদের কাতারে আমার নাম থাকত।

এমনিভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার উপর যে সকল কষ্ট-মসীবত পতিত হয়, তাও আল্লাহ পাকের মহাব্বত-ভালবাসা ও স্নেহ-মমতার যথাযথ বহিঃপ্রকাশ এবং মানুষের মর্তবা বৃদ্ধির জন্য এসব দুঃখ-কষ্ট তাদেরকে প্রদান করা হচ্ছে, তবে শর্ত হলো কষ্ট-মসীবতে পতিত হয়ে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করার তওফীক হলে তখন মনে করতে হবে এই কষ্ট-মসীবত আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ এবং রহমত।

হযরত আইয়ূব আলাইসি সালাম এবং কষ্ট-মসীবত

হযরত আইয়ূব (আঃ)-এর প্রতি দেখুন। কত কঠিন রোগে তিনি আক্রান্ত ছিলেন যে, তা স্মরণ করলে মানুষের গা শিউরে উঠে। এই কঠিন অবস্থায়ও শয়তান তাঁর নিকট আসে তাঁকে কষ্ট দেয়ার জন্য। এসে বলে আপনার গোনাহের কারণে আমাকে এই রোগে আক্রান্ত করা হয়েছে। আল্লাহপাক আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট। ফলে তিনি আপনাকে এই রোগ দিয়েছেন, তাঁর আযাব হিসেবে আপনার উপর এই কষ্ট-মসীবত আসছে। এই বলেই শয়তান ক্ষান্ত হয়নি বরং তার মতের স্বপক্ষে সে দলীল-প্রমানও পেশ করে।

এ অবস্থায়ও হযরত আইয়ূব (আঃ) শয়তানের সাথে বাকযুদ্ধে লিপ্ত হন। বাইবেলের ছহীফায়ে আইয়ূবীতে শয়তানের সাথে হযরত আইয়ূব (আঃ)-এর এই বাকযুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

সুতরাং হযরত আইয়ূব (আঃ) শয়তানের জবাবে বললেন, তোমার মন্তব্য ঠিক নয় যে, আমার গোনাহের কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা আযার এবং শাস্তি হিসেবে এসেছে, বরং আমার এই কষ্ট আমার খালেক এবং মালেকের পক্ষ থেকে মহাব্বতের শিরোপা এবং আমার প্রতিপালক স্বীয় অনুগ্রহে এবং রহমতে এই কষ্ট আমাকে প্রদান করছেন। আমি আমার প্রভুর নিকট এই প্রার্থনা অবশ্যই করি যে, প্রভু হে! আপনি আমাকে এই রোগ থেকে সুস্থতা দান করুন। কিন্তু এই রোগের কারণে আমার প্রতিপালকের প্রতি আমার কোন অভিযোগ নেই কোন প্রশ্ন নেই যে, তিনি আমাকে এই রোগ কেন প্রদান করলেন।

আলহামদুলিল্লাহ! প্রতিদিন আল্লাহর নিকট আমি নিজেকে উপস্থাপন করি এবং এই দোয়া করি ঃ

رَبِّ اِنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ০

অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! আমি এই কষ্টে পতিত আর আপনি আরহামুর রাহিমীন সুতরাং আপনি আমার কষ্ট দূর করে দিন।

সুতরাং তাঁর দিকে আমার এই যে মনোনিবেশ সেটাও তাঁর পক্ষ থেকে প্রদত্ত আর তিনি যখন তাঁর দরবারে বারবার মনোনিবেশ করার তওফীক আমাকে দিচ্ছেন, তো এটাই এর প্রমান যে, এই কষ্ট-মসীবত তার পক্ষ থেকে রহমত ও মহাব্বতের একটি শিরোপা। এসব আলোচনা 'ছহীফায়ে আইয়ূবী'তে উল্লেখ রয়েছে।

কষ্ট-মসীবত রহমত হওয়ার আলামত

এখানে হযরত আইয়ূব (আঃ) এ কথা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন, কোন্ ধরনের কষ্ট-মসীবত আল্লাহ পাকের আযাব এবং শাস্তি আর কোন্ ধরনের কষ্ট-মসীবত আল্লাহ পাকের রহমত এবং পুরস্কার। তা এই যে, প্রথম প্রকার কষ্ট-মসীবতে মানুষ আল্লাহর উপর অভিযোগ উত্থাপন করে এবং আল্লাহর তকদীরের উপর আপত্তি তুলে এবং আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করে না। আর দ্বিতীয় প্রকার কষ্ট-মসীবতে আল্লাহ পাকের প্রতি মানুষ কোন অভিযোগ করে না, বরং দোয়া করে, হে আল্লাহ! আমি কমজোর, দুর্বল। এই কষ্ট-মসীবত উৎরে উঠার মত সামর্থ আমার নেই। স্বীয় অনুগ্রহে আপনি আমাকে এই কষ্ট-মসীবতের পরীক্ষা থেকে উদ্ধার করুন।

অতএব যখনি কোন দুঃখ-কষ্টের মুহূর্তে, দুশ্চিন্তা-মসীবতের মুহূর্তে রোগ-বিমারে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করার তওফীক হবে, তখন বুঝে নিবে আলহামদুলিল্লা! এই রোগ-বিমার, এই দুশ্চিন্তা, এই কষ্ট-দুঃখ আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত হিসেবে এসেছে। এ অবস্থায় ভয় পাওয়া বা ঘাবড়ানোর কোন প্রয়োজন নেই। কেননা এই কষ্ট-মসীবত অবশেষে একদিন তোমার জন্য মঙ্গল ও কল্যাণ বয়ে আনবে ইনশাআল্লাহ। ব্যাস

শর্ত এই যে আল্লাহ পাকের দিকে মনোনিবেশের তওফীক হয়ে যাওয়া। কারণ যদি এটা আযাব আর শাস্তিই হত, তাহলে এ মুহূর্তে আল্লাহ পাক তাঁর নাম নেয়া এবং তাঁর দিকে মনোনিবেশের তওফীকই দিতেন না। যখন তিনি তওফীক দিয়েছেন, বুঝতে হবে এই দুঃখ-কষ্ট, বিপদাপদ-মসীবত আল্লাহর রহমত, গযব নয়।

দোয়া কবুল হওয়ার আলামত

অবশ্য এখানে একটি প্রশ্ন সৃষ্টি হয় এই যে, কখনও দুঃখ-কষ্ট-মসীবতে পতিত হয়ে আল্লাহর নিকট দোয়া করা হয় এবং তাঁর দিকে মনোনিবেশ করা হয়, তা সত্ত্বেও দেখা যায় কষ্ট-মসীবত দূর হয় না দোয়া কবুল হয় না...। এর জবাব হলো, আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে পারা এবং কাকুতি-মিনতি করার তওফীক হওয়াই এ কথার দলীল যে, আমাদের দোয়া কবুল হয়েছে। নতুবা দোয়া করার তওফীকই হত না। এখন কষ্ট-মসীবতের জন্য আলাদা পুরস্কার মিলবে এবং দোয়া করার দ্বারা ভিন্ন পুরস্কার প্রাপ্ত হবে। সুতরাং কষ্ট-মসীবত মর্তবা বৃদ্ধির ওসীলা হচ্ছে। এ ব্যাপারে মাওলানা রূমী (রাহঃ) বলেন ঃ

گفت آں "الله" تو لبيك ماست

অর্থাৎ যখন তুমি আমার নাম নিবে এবং 'আল্লাহ' বলবে, তোমার 'আল্লাহ' বলাই আমার পক্ষ থেকে 'লাব্বাইক' (আমি উপস্থিত) বলা। তোমার 'আল্লাহ' বলা এ কথার প্রমাণ যে, আমি তোমার ডাক শুনেছি এবং তা কবুল করে নিয়েছি। সুতরাং দোয়ার তওফীক হওয়াই আমার পক্ষ থেকে দোয়া কবুল হওয়ার আলামত। তবে এটা আমার হেকমতের দাবী যে, কখন তোমাকে আমি দুশ্চিন্তা মুক্ত করব এবং কতক্ষণ পর্যন্ত তা অবশিষ্ট রাখব। তোমরা তো তাড়াহুড়া প্রিয়, তাই খুব দ্রুত কষ্ট-মসীবত দূর করতে চাও, কিন্তু এই কষ্ট-মসীবত কিছুদিন পর দূর করা হলে এর ফলে তোমার মর্তবা অনেক উর্দ্ধে উঠে যাবে। সুতরাং কষ্ট-মসীবতে অভিযোগ ও আপত্তি উঠাতে নেই। অবশ্য এই দোয়া অবশ্যই করা উচিত যে, হে আল্লাহ! আমি কমজোর-দুর্বল, আমার দ্বারা এই কষ্ট-মসীবত বরদাশ্ত করা সম্ভব হচ্ছে না, আমাকে এর থেকে উদ্ধার করুন।

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব (রাহঃ)-এর ঘটনা

কষ্ট-মসীবত প্রার্থনার বিষয় নয় যে, বলবে হে আল্লাহ! আমাকে কষ্ট-মসীবত প্রদান করুন। কিন্তু কষ্ট-মসীবতে পতিত হলে ধৈর্যধারণ করবে। ধৈর্যধারণ করার অর্থ হলো কষ্ট-মসীবতের উপর অভিযোগ তুলবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কষ্ট-মসীবত থেকে আশ্রয় কামনা করেছেন। এক দোয়ায় তিনি বলেছেন, 'হে আল্লাহ! আমি মন্দ রোগ-বিমার ও ব্যাধি থেকে আপনার আশ্রয় কামনা করছি।' কিন্তু কখনও কষ্ট-মসীবতে পতিত হয়ে গেলে সেটাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত মনে করেছেন এবং তা দূর করার জন্য দোয়াও করেছেন।

হযরত থানভী (রাহঃ) স্বীয় মাওয়ায়েজে এই ঘটনাটি লিখেন যে, একদা হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ (রাহঃ) এই বিষয়ের উপর আলোচনা রাখছিলেন যে, যত প্রকার কষ্ট-মসীবত রয়েছে, তা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে রহমত এবং পুরস্কার। তবে শর্ত হলো বান্দা সেটাকে মূল্যায়ন করতে হবে এবং আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করতে হবে।

মজলিস চলাকালীন এক ব্যক্তি এসে উপস্থিত হল, যে কুষ্ঠ রোগে ভুগছিল এবং এই রোগের কারণে তার সর্বাঙ্গ গলে গিয়েছিল। মজলিসে উপস্থিত হয়ে সে হাজী সাহেব (রাহঃ)কে বললেন, হযরত আমার জন্য দোয়া করুন আল্লাহ তা'আলা যেন আমার এই কষ্ট দূর করে দেন..।

উপস্থিত লোকেরা ভাবতে লাগল, এই মাত্র তিনি বয়ান করলেন, যত প্রকার রোগ-বিমার রয়েছে, তা সবই আল্লাহর রহমত এবং পুরস্কার আর এই ব্যক্তি তা দূর করার জন্য দোয়া চাচ্ছে। এখন হাজী সাহেব (রাহঃ) কি এই দোয়া করবেন যে, হে আল্লাহ! তার থেকে রহমত দূর করে দাও?

হযরত হাজী সাহেব (রাহঃ) দোয়ার জন্য হাত উঠালেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহ! যে রোগ-বিমার ও কষ্টে এই লোক পতিত, যদিও তা তোমার পক্ষ থেকে রহমত এবং পুরস্কার, কিন্তু আমরা কমজোরী এবং দুর্বলতার কারণে তা বরদাশ্ত করতে পারছি না। সুতরাং এই কষ্টের নেয়ামতকে তুমি সুস্থতার নেয়ামত দ্বারা পরিবর্তন করে দাও...।'

একেই বলে দ্বীনের গভীর সমঝ, যা বুযুর্গগণের সংসর্গে অর্জিত হয়।

হাদীসের সারকথা

মোটকথা এই হাদীসের সারকথা এই যে, যখন আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দাকে ভালবাসেন, মহাব্বত করেন, তখন তাকে পরীক্ষায় ফেলেন এবং বলেন, এই বান্দার কান্নাকাটি, আহাজারী এবং কাকুতি-মিনতি আমার নিকট খুব ভাল লাগে। এ জন্য আমি তাকে কষ্ট দিচ্ছি, যেন সে আমাকে ডাকে আর এই ডাকার ফলে আমি তার মর্তবা বৃদ্ধি করে দেই এবং তাকে উচ্চ থেকে উচ্চতর মাকামে পৌঁছে দেই।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে রোগ-বিমার ও কষ্ট-মসীবত থেকে দূরে রাখুন এবং কষ্ট-মসীবতে পতিত হয়ে গেলে ধৈর্যধারণের তওফীক প্রদান করুন এবং তাঁর দিকে মনোনিবেশ করার তওফীক দান করুন। আমীন।

কষ্ট-মসীবতে দীনতা-হীনতা প্রকাশ করা উচিত

কোন কোন বুযুর্গ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তারা কষ্ট-মসীবতে পতিত হয়ে হা-হুতাশ করতেন এবং ব্যথা-বেদনার কষ্ট প্রকাশ করতেন। এখানে বাহ্যত: মনে হতে পারে কষ্ট-মসীবতের কারণে হা-হুতাশ করা এবং কষ্ট প্রকাশ করাও তো না-শোকরী এবং পতিত কষ্টের উপর এক ধরণের অভিযোগ যে, আমাকে এই কষ্ট কেন দেয়া হল? আর কষ্টের উপর না-শোকরী করা জায়েয নেই...। এর জবাবও এই হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, যারা আল্লাহর নেককার এবং প্রিয় বান্দা হন, তাঁরা অভিযোগের কারণে মসীবতের উপর কষ্ট প্রকাশ করেন না, বরং তাঁরা বলতে চান, আমাদেরকে এ জন্য কষ্ট-মসীবত দেয়া হচ্ছে, যেন আমরা আল্লাহর সম্মুখে আহাজারী এবং দীনতা-হীনতা প্রকাশ করি এবং নিজের অপারগতা প্রকাশ করি এবং পাশাপাশি হা-হুতাশও করি। কারণ আল্লাহপাক আমাদেরকে দুঃখ-কষ্টে পতিতই করেছেন, আমাদের আহাজারী শ্রবনের উদ্দেশ্যে, আমাদের রোনাজারী শ্রবনের উদ্দেশ্যে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে বাহাদুরী দেখানো ঠিক নয়।

এক বুযুর্গের ঘটনা

আমি আমার শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত মুফতী শফী (রাহঃ)-এর নিকট শুনেছি একদা এক বুযুর্গ কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। অন্য এক বুযুর্গ তাঁর

সেবা-শুশ্রূষার জন্য গেলেন। গিয়ে দেখলেন, সে বুযুর্গ 'আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ' যিকিরে মশগুল। সেবা করতে যাওয়া বুযুর্গ এ অবস্থা দেখে বললেন, আপনার এই আমল তো খুবই প্রশংসনীয় যে, আপনি আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করছেন, কিন্তু এ অবস্থায় সামান্য হা-হুতাশও করুন। কারণ হা-হুতাশ না করলে আপনার রোগ ভাল হবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এই রোগ এ জন্য দিয়েছেন, যাতে আল্লাহর দরবারে আহাজারী করা হয় আর গোলামীর দাবীও এটা যে মানুষ আল্লাহর সম্মুখে বাহাদূরী প্রকাশ করবে না, বরং দীনতা-হীনতা এবং দুর্বলতা প্রকাশ করবে এবং বলবে-হে আল্লাহ! আমি দুর্বল-অপারগ, এই রোগ সহ্য করার ক্ষমতা আমার নেই। সুতরাং আমার এই রোগ ভাল করে দিন...।

আমার বড় ভাই মরহুম জনাব যাকী কায়ফী সাহেব অত্যন্ত সুন্দর কবিতা আবৃতি করতে জানতেন। এ বিষয়ের উপর তিনি খুব চমৎকারভাবে একটি কবিতা আবৃতি করতেন ঃ

اس قدر بھی ضبط غم اچھا نہیں

توڑنا ہے حسن کا پندار کیا

অর্থাৎ যখন আল্লাহ তা'আলা কাউকে কোন কষ্ট-মসীবত প্রদান করেন, তখন সে কষ্ট-মসীবতে একেবারে মুখ বুজে পড়ে থাকা, ন্যূনতম আহাজারী এবং বিন্দু পরিমান কষ্ট প্রকাশ না করা এটা ভাল লক্ষণ নয়, আল্লাহর সম্মুখে কি নিজের বাহাদুরী প্রকাশ করা উদ্দেশ্য যে, তুমি যা ইচ্ছা তাই করো আমি যেমনটি ছিলাম তেমনটিই থাকব।...নাউযুবিল্লাহ...সুতরাং আল্লাহর সম্মুখে অপারগতা এবং দীনতা-হীনতা প্রকাশ করা উচিত।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

হযরত থানভী (রাহঃ) এক বুযুর্গের ঘটনা লিখেন, একবার কোন এক অবস্থায় তাঁর মুখ দিয়ে এই বাক্যটি বের হয়ে গেল অর্থাৎ তিনি আল্লাহকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

ليس لى فى سواك حظ

فكيف ما شئت فاختبرنى

'হে আল্লাহ! আপনি ব্যতীত কোন সত্তায় কোন কাজে আমার স্বাদ-মজা নেই, সুতরাং আপনি যেভাবে ইচ্ছা আমাকে পরীক্ষা করে নিন।...নাউযুবিল্লাহ...কেমন যেন তিনি আল্লাহকে পরীক্ষার আহবান জানাচ্ছেন। ফল এই হলো যে, তাঁর পেশাব বন্ধ হয়ে গেল। তাঁর পেশাবের থলি পেশাবে ভরা কিন্তু পেশাব বের হচ্ছে না। বেশ কয়দিন এভাবে অতিবাহিত হল। সবশেষে তিনি বুঝতে সক্ষম হলেন যে, কত বড় ভুল বাক্য আমার মুখ দিয়ে বের হয়ে গেছে। এই বুযুর্গের নিকট ছোট ছোট বাচ্চারা পড়ার জন্য আসত, এ অবস্থায় তিনি ছোট বাচ্চাদেরকে বলতেন। ادعوا لعمكم الكذاب অর্থাৎ তোমরা তোমাদের মিথ্যুক চাচাজীর জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া কর, তিনি যেন আমাকে এই রোগ থেকে মুক্তি দান করেন, কেননা তোমাদের চাচাজী মিথ্যা দাবী করে বসেছিল।

আল্লাহ তা'আলা দেখিয়ে দিলেন তুমি এই দাবী করতে চাও যে, কোন কিছুতেই তোমার স্বাদ নেই, আরে মিয়া তোমার তো পেশাবেই প্রকৃত স্বাদ। সুতরাং আল্লাহ পাকের সামনে বাহাদুরী চলে না।

কষ্ট-মসীবতে রাসূল (সাঃ)-এর তরীকা

সুতরাং কষ্ট-মসীবতে অভিযোগ করাও চলবে না আবার বাহাদুরী প্রকাশও চলবে না, বরং উভয়ের মাঝামাঝি মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অন্তিম শয্যায় মৃত্যুকষ্টে পতিত, হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, এ সময় তিনি বার বার স্বীয় হাত মুবারক পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিতেন এবং স্বীয় চেহারা মুবারকে মুছতেন এবং কষ্ট প্রকাশ করতেন। অবস্থাদৃষ্টে হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) বললেন واكرب اباه অর্থাৎ আমার আব্বাজানের কতই না কষ্ট হচ্ছে! জবাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন لا كرب ابيك بعد اليوم অর্থাৎ আজকের দিনের পর তোমার পিতার আর কষ্ট হবে না।

দেখুন এখানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কষ্ট প্রকাশ করেছেন, কিন্তু অভিযোগ তুলেননি, বরং পরবর্তী মঞ্জিলের শান্তির প্রতি ইংগিত করেছেন। এটা হল সুন্নত তরীকা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহেবজাদা হযরত ইব্‌রাহীমের ইন্তেকাল হলে তিনি বলেছিলেন ঃ

انا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون

অর্থাৎ হে ইব্‌রাহীম! তোমার বিরহে আমি অত্যন্ত ব্যথিত এবং দুঃখ-ভারাক্রান্ত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহেবজাদী হযরত যয়নব (রাযঃ)-এর বাচ্চা তাঁর কোলে। তাঁর কোলে থাকাবস্থায়ই বাচ্চার প্রাণ বের হয়ে যাচ্ছে। তাঁর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। এভাবেই আবদিয়ত এবং বন্দেগীর প্রকাশ ঘটিয়েছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে, হে আল্লাহ! আপনার ফায়সালাই চূড়ান্ত সঠিক! কিন্তু আপনি এই কষ্ট এ জন্য প্রদান করেছেন, যেন আমি আপনার সম্মুখে চোখের অশ্রু ফেলে নিজের দীনতা-হীনতা প্রকাশ করি, অপারগতা প্রকাশ করি।

সুতরাং সুন্নত তরীকা হলো এই যে, দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়ে আপত্তি-অভিযোগও করবে না এবং বাহাদুরীও প্রকাশ করবে না, বরং আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে ফরিয়াদ করবে, 'প্রভু হে! আমার এই দুঃখ-মসীবত দূর করে দাও'।

এটাই সুন্নত তরীকা এবং এটাই হাদীসের সারকথা। আল্লাহ তা'আলা এর সঠিক বুঝ আমাদেরকে দান করুন এবং আমল করার তাওফীক দান করুন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ